কিশোর কাহিনি সিরিজ

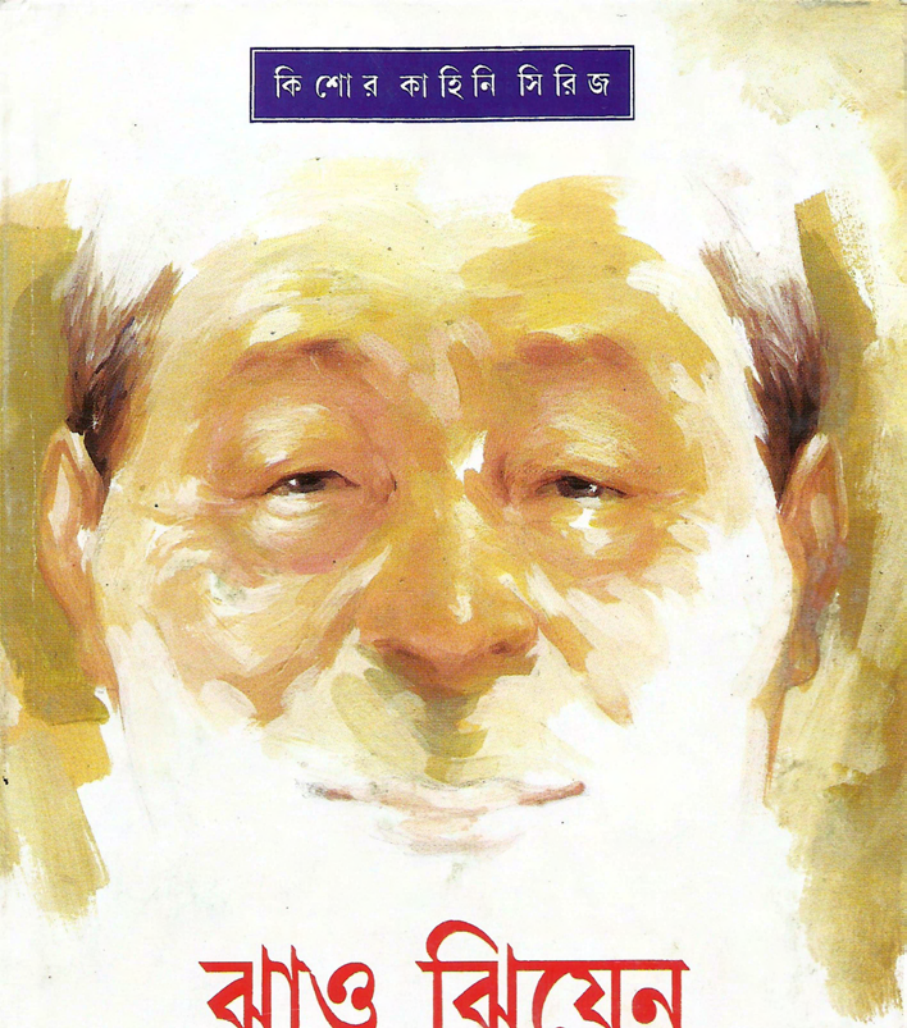

ঝাও ঝিয়েন হত্যারহস্য

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

আনন্দ

ঝাও ঝিয়েন হত্যারহস্য

ঝাও ঝিয়েন হত্যারহস্য

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

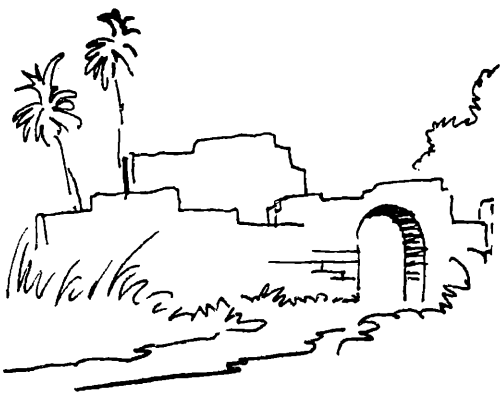

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অমিতাভ চন্দ্র

আনন্দ

স্নেহের তিতানকে—

টেলিফোনটা রেখেই আনন্দে লাফিয়ে উঠল টুপুর। রোববার সকালে এমন একটা সুসংবাদ! এইমাত্র পার্থমেসো জানাল, এবার মুম্বই যাওয়া হচ্ছে সদলবলে। শুধু তাই নয়, অজন্তা ইলোরা ঘুরে আসারও প্ল্যান আছে। বেরোনো হবে লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন, ফেরা দেওয়ালির পরে। সব মিলিয়ে প্রায় দু'সপ্তাহ। টানা চোদ্দো দিন মিতিনমাসির লেজ হয়ে থাকতে পারবে টুপুর, তার মধ্যে একটাও কি রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটবে না?

অবনী ডাইনিং টেবিলে বসে পাকা পেঁপে খাচ্ছেন। সহেলি আর টুপুরের মতো ছুটির সকালে লুচি-পরোটা, ভাজাভুজি খাওয়া তাঁর একদমই পছন্দ নয়। ইদানীং তিনি বেশি করে ফলাহারে মন দিয়েছেন। শশা, আপেল, আনারস, কলা, কমলালেবু, যখন যা পাওয়া যায়।

বেড়ানোর খবরটায় অবনীর তেমন হেলদোল দেখা গেল না। ছোট্ট কাঁটায় এক টুকরো পেঁপে গেঁথে বললেন, "অজন্তা ইলোরা আমার দু'বার ঘোরা। মুম্বইও গিয়েছি বারচারেক। এবারে মহারাষ্ট্রের দুর্গগুলো দেখে আসতে পারলে কাজের কাজ হয়।"

সঙ্গে সঙ্গে সহেলি হাঁ হাঁ করে উঠেছেন, "কখনও না। আমি মরে গেলেও কোনও দুর্গে যাব না।"

টুপুর অবাক মুখে বলল, "কেন মা? দুর্গ তো খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা। এক-একটা দুর্গ মানে, এক-একটা ইতিহাস। আর মহারাষ্ট্রের অনেক ফোর্টই তো ছত্রপতি শিবাজির তৈরি। ইন্ডিয়ার হিস্ট্রি জানতে গেলে ওই ফোর্টগুলো তো দেখা দরকার।"

"নিকুচি করেছে তোর ইতিহাসের।" সহেলি ঝেঁঝে উঠলেন, "যা উঁচু উঁচু সিঁড়ি হয় কেল্লাগুলোর, বাপ্‌স। মনে আছে, রাজস্থানের যোধপুর ফোর্টে গিয়ে আমার কী হাল হয়েছিল? হাঁটু নাড়তে পারছি না, কোমর ঝনঝন, দরদরিয়ে ঘামছি..."

"অজন্তা ইলোরা গেলেও কিন্তু হাঁটতে হবে, মা। পাহাড়ে চড়তে হবে।"

"সে আমি রাজি আছি। সুন্দর জিনিস দেখার জন্য কষ্ট করতে আমার আপত্তি নেই।"

"বা রে, দুর্গে বুঝি সুন্দর সুন্দর জিনিস নেই?"

অবনী পেঁপে শেষ করে ন্যাপকিনে মুখ মুছলেন। বললেন, "প্রায় প্রতিটি দুর্গেই একটা করে মিউজ়িয়াম থাকে। সেখানে রাজা-রাজড়াদের পোশাকআশাক, সেই সময়কার অস্ত্র, বাহন, পালকি, হাতির পিঠের হাওদা..."

"খ্যামা দাও। খ্যামা দাও। ওই সব ভারী ভারী ঢাল তলোয়ার দেখে দেখে আমার চোখ পচে গিয়েছে। এবার আর ওসবের ছায়া মাড়াচ্ছি না।"

অবনী গোমড়া মুখে বললেন, "তোমরা যা খুশি করো। তবে টুরে কেল্লা না থাকলে আমাকে তোমরা বাদ দাও। পুজোর ছুটিটা আমি বাড়িতেই থাকব।"

সহেলি বললেন, "তা হলে এও শুনে রাখো, তোমাদের কেল্লা ঘোরার মতলব থাকলে আমি নেই। ...টুপুর, এখনই তোর পার্থমেসোকে জানিয়ে দে আমাকে ছাড়াই যেন প্রোগ্রাম করা হয়।"

এ তো মহা ফ্যাচাং। কোথায় কোথায় যাওয়া হবে তার এখনও ঠিক নেই, তার আগেই বাবা-মা ফাইট শুরু করে দিলেন? মাঝখান থেকে বেড়ানোটাই না কেঁচে যায়!

দু'হাত তুলে টুপুর বলল, "ঠান্ডা হও। আগেই মাথা খারাপ

কোরো না। একটা-দুটো ফোর্ট তো টুর প্রোগ্রামে থাকতেই পারে। ইচ্ছে যদি না হয়, মা ফোর্টে ঢুকবে না। ওই সময়টায় নিশ্চিন্ত মনে শপিং সারবে।"

এই প্রস্তাবটা দু'জনেরই মনোমতো হয়েছে। অবনী খানিকটা সন্তুষ্ট হয়ে অজন্তা আবিষ্কারের কাহিনি শোনাতে শুরু করলেন টুপুরকে। কিছু কিছু টুপুরের জানা, অনেকটাই অজানা। সেই ১৮১৯ সালে কীভাবে একদল ব্রিটিশ শিকারির চোখে পড়ে গিয়েছিল গুহাগুলো, তারপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পাঠানো শিল্পীরা কত কষ্ট করে কুড়ি বছর ধরে অজন্তা গুহার ছবিগুলোকে নকল করল, আবার সামান্য অসাবধানতার জন্য ইংল্যান্ডের কেনসিংটন প্রাসাদে রাখা সেই ছবিগুলোর বেশিরভাগই কেমন করে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল...। ভারী গুছিয়ে বলছেন অবনী, সহেলিও মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছেন।

আপন মনেই সহেলি বিড়বিড় করে উঠলেন, "কী কাণ্ড বলো তো! ভাগ্যিস ইংরেজ শিকারিদের ঘোড়াগুলো জল খাওয়ার জন্য ছটফট করেছিল! নইলে হয়তো অজন্তা গুহার খবরই পাওয়া যেত না!"

অবনী বললেন, "অনেক বড় বড় আবিষ্কারই ওরকম হঠাৎ হয়ে যায়। ভীমবেট্‌কা গুহার ছবিগুলোও তো হঠাৎ খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল।"

টুপুর বলল, "তারপর ধরো, কাশ্মীরের অমরনাথ। এক রাখালের ভেড়া হারাল, আর সেই ভেড়া খুঁজতে গিয়ে...।"

সহেলি বললেন, "সে তো শুনেছি ক্রিস্টোফার কলম্বাসও ভারতে আসার জন্য বেরিয়ে, দিক ভুল করে পৌঁছে গিয়েছিলেন আমেরিকায়।"

জমে-ওঠা আড্ডায় ছেদ পড়ল আচমকা। ডোরবেল বেজে উঠেছে।

দরজা খুলে একটু অবাকই হল টুপুর। কুশল! সঙ্গে আবার একটা চাইনিজ় ছেলে!

কুশল টুপুরের পাড়ার বন্ধু। মোড়ের হলুদ বাড়িটায় থাকে কুশল, বড়-একটা আসে না এ-বাড়িতে, রাস্তাঘাটে দেখা হলে গল্প-আড্ডা হয় টুপুরের সঙ্গে।

তা সেই কুশল এক চীনা ছেলেকে নিয়ে...?

টুপুর কোনও প্রশ্ন করার আগে কুশল বলে উঠল, "একটা জরুরি দরকার ছিল রে। আমার এই বন্ধুকে একটু হেল্‌প করতে হবে।"

"কী ব্যাপারে?"

"তোর এক মাসি খুব নামী ডিটেকটিভ না?"

"হ্যাঁ! মিতিনমাসি। প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়। ভেরি ভেরি ফেমাস। পুলিশ কমিশনার পর্যন্ত আমার মাসিকে সমঝে চলে।"

"সেই মাসির সঙ্গে আমার এই বন্ধুর একটু যোগাযোগ করিয়ে দিবি?" বলেই জিভ কাটল কুশল, "দেখেছিস কাণ্ড! তোর সঙ্গে লিয়াংয়ের আলাপ করিয়ে দিতেই তো ভুলে গিয়েছি।"

দু'মিনিটেই আলাপ পরিচয়ের পালা শেষ। লিয়াং নিজেই জানাল, তার পুরো নাম ঝাও লিয়াং, সে কুশলের ক্লাসমেট, থাকে মধ্যকলকাতার ছাতাওয়ালা গলিতে। টুপুরের ভাল নাম ঐন্দ্রিলা শুনে বার কয়েক বিড়বিড় করে নামটা উচ্চারণের চেষ্টা করল লিয়াং, তারপর লজ্জা লজ্জা মুখে বলল সে তাকে 'তুপুর' নামেই ডাকবে।

কুশল আর লিয়াংকে নিজের ঘরে এনে বসাল টুপুর। সহেলি একবার উঁকি দিয়ে গেলেন দরজায়, তাঁর চোখে একরাশ কৌতূহল। ভ্রুকুটি করে মাকে এখন ঘরে আসতে বারণ করল টুপুর।

ফ্যান চালিয়ে দিয়ে টুপুর বলল, "হ্যাঁ, এবার ব্যাপারটা আমায় খুলে বল।"

"তুই?" কুশল নাক কুঁচকোল, "তোকে বলে কী হবে?"

"আহা, শুনিই না। আমাকে এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছিস কেন? অনেক কেসেই আমি মাসির অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকি, আমিই হয়তো লিয়াং-এর প্রবলেমটা সল্‌ভ করে দিতে পারব।"

কুশল হেসে ফেলল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "অলরাইট। ...লিয়াং, বল তা হলে।"

ছোটখাটো চেহারায় লিয়াংয়ের চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। সিনেমার হ্যারি পটারের স্টাইলে কাটা চুল। কব্‌জিতে শোভা পাচ্ছে একটা কালো ব্যান্ড। চশমার কাচের আড়াল থেকে ছেলেটার সরু সরু চোখ দুটো পিটপিট করে উঠল। তার পরেই লিয়াং বলতে শুরু করেছে, "লাস্ট উইকে আমাদের ফ্যামিলিতে একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এ ব্যাড ইন্সিডেন্ট। আমার বো...আই মিন আমার কাকা... একটা কার-অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে, কাকাকে কেউ ইচ্ছে করে মেরে দিয়েছে।"

টুপুর নড়েচড়ে বসল, "কেন? এরকম মনে হচ্ছে কেন?"

"কারণ, আমার কাকা অত্যন্ত সাবধানি মানুষ ছিলেন। খুব দেখেশুনে রোড ক্রস করতেন। দু'দিক ভালভাবে না দেখে তিনি ফুটপাত থেকে নামতেনই না। আমরা তাই নিয়ে কত ঠাট্টা-রসিকতাও করেছি। এমন একজন লোককে একটা গাড়ি কী করে ধাক্কা দিল, কিছুতেই বুঝতে পারছি না।"

"কোথায় হয়েছিল অ্যাকসিডেন্টটা?"

"জায়গাটাও খুব অড। সেই প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে। কাকা যে ওখানে সন্ধেবেলা কেন গিয়েছিলেন, সেটাও আমাদের মাথায় ঢুকছে না। কাকার বডিটাও পড়ে ছিল একেবারে ফুটপাতের গা ঘেঁষে। কোনও গাড়ি রাস্তার অতটা ধারে এসে কী করে যে তাঁকে চাপা দিল...!"

লিয়াংয়ের কথায় প্রচুর ইংরেজি শব্দ আছে বটে, তবে তার

বাংলাটাও মন্দ নয়। উচ্চারণে একটা বিচিত্র টান থাকলেও বুঝতে তেমন অসুবিধে হয় না।

একটু থেমে থেকে লিয়াং ফের বলল, "আরও একটা ব্যাপার। কাকার কাছে একটা জিনিস থাকার কথা ছিল। জিনিসটা কিন্তু ডেডবডির কাছাকাছি কোথাও পাওয়া যায়নি। কাকার মোবাইল ফোনটাও মিসিং। অথচ কাকার ঘড়ি, পার্স, টাকাকড়ি কিচ্ছু খোওয়া যায়নি। পার্সে আড়াই হাজার টাকা ছিল। টাকাটা নিল না, অথচ একটা পুরনো মোবাইল ফোন আর সেই জিনিসটা ভ্যানিশ হয়ে গেল... এটা কি খুব স্ট্রেঞ্জ নয়? সেই জন্যই আমাদের সন্দেহ, সামওয়ান অথবা কোনও গ্যাং আমার কাকাকে মার্ডার করেছে।"

মার্ডার শব্দটা শুনে একটু কেঁপে উঠল টুপুর। অস্ফুটে জিজ্ঞেস করল, "জিনিসটা কী জানতে পারি?"

"সেটা তো আমরাও সঠিক জানি না। তবে কোনও শোপিস-টোপিস ধরনের কিছু হবে। মানে, কাকা আমাদের সেরকমই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।"

টুপুরের কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। ঘটেছে কার-অ্যাকসিডেন্ট, অথচ লিয়াংয়ের মনে হচ্ছে খুন! একটা জিনিস লিয়াংয়ের কাকার কাছে থাকার কথা ছিল, কিন্তু জিনিসটা কী তা-ও লিয়াংরা জানে না! অর্থাৎ আসল ক্লুটাই নেই। কেসটা কি টুপুরের পক্ষে একটু বেশি জটিল হয়ে যাচ্ছে না?

মুখে অবশ্য ঘাবড়ানো ভাবটা ফুটতে দিল না টুপুর। মাথা নেড়ে বলল, "খুবই ইন্টারেস্টিং। ... দাঁড়াও, মাসির সঙ্গে একবার কথা বলে আসি।"

ফোন করতেই ওপারে পার্থমেসো, "কী রে, বেড়ানোর নাম শুনেই লাফ-ঝাঁপ শুরু হয়ে গিয়েছে বুঝি? একটু ধৈর্য ধর, আগে টিকিট-ফিকিট কাটি।"

টুপুর বলল, "না গো, বেড়ানো নয়, অন্য ব্যাপার। একটু মিতিনমাসিকে ডেকে দেবে?"

"সে কি এখন তোর সঙ্গে কথা বলবে? সকাল থেকেই যা ব্যস্ত!"

"কেন?"

"একটা জাল উইলের কেস সল্‌ভ করছে। এখন ফাইনাল স্টেজ। দরজা বন্ধ করে নিজের অফিসরুমে বসে মাথার চুল ছিঁড়ছে।"

"ও।" টুপুর সামান্য মিইয়ে গেল, "তা-ও যদি একটু কথা বলা যেত...! এখানেও একটা বেশ মিস্টিরিয়াস কেস..."

"তুইও আজকাল কেস ধরছিস নাকি?"

"না গো। আমার এক বন্ধু এসেছে। মিতিনমাসির খোঁজেই। একজন চিনা ভদ্রলোক..."

"ওরে বাবা, চিনেম্যানদের কেস! তা হলে তো রহস্য ঘনীভূত। ধর, ডেকে দিচ্ছি।"

মিতিনমাসি ফোনে এল বটে, কিন্তু যেন মন দিয়ে শুনছে না। তবু যেটুকু জেনেছে, তার সবটুকুই উগরে দিল টুপুর। বেশ উত্তেজিতভাবে।

টুপুর থামার পর মিতিন বলল, "হুম। কিন্তু আমি তো এখনই ওদের মিট করতে পারব না রে টুপুর। এখনও অন্তত দু'-তিনটে দিন আমাকে ছোটাছুটি করতে হবে।"

"তা হলে ওদের কী বলব? তিন দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা করতে?"

"তা কেন। সময় গড়িয়ে যেতে দেওয়াটা ঠিক নয়। তুইই বরং ডিটেলে শুনে নে। যদি কারও সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন হয়, ঘুরেও আয়। গিয়ে কথাবার্তা বল, তারপর দেখা যাক, কী করা যায়।"

"আমি ...? একা-একা ...?"

"সাহস আন। আত্মবিশ্বাস জোরদার কর। ইনভেস্টিগেশনে গিয়ে চোখকান খোলা রাখবি, ফিরে এসে সব স্টেটমেন্ট নোট করবি।"

"পারব আমি?"

"কিছুই যদি না পারিস, তোর উপর আমি ভরসা করব কী করে? তোর যে বন্ধুটা লিয়াংকে নিয়ে এসেছে, তাকেই আপাতত অ্যাসিস্ট্যান্ট করে নে। আজ বিকেলেই ছাতাওয়ালা গলিতে চলে যা।"

ফোন রেখে টুপুর চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। পায়ে পায়ে ঘরে ফিরে দেখল, সহেলি প্লেট-ভরতি সন্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, লিয়াং খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, কুশল টপাটপ সাঁটাচ্ছে।

মুখ-ভরতি সন্দেশ নিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করল, "কী বললেন মাসি?"

"মাসি এখন অন্য একটা কেস নিয়ে ব্যস্ত রে। আমাকেই তদন্ত শুরু করতে বলল," টুপুর গলায় একটা ভারিক্কি ভাব আনল, লিয়াংয়ের দিকে ফিরে বলল, "হ্যাঁ, তোমার কেসটা এবার একটু ডিটেলে শোনা যাক। আমি যা-যা প্রশ্ন করব, ঠিক-ঠিক উত্তর দেবে। কিচ্ছু লুকোবে না, কেমন?"

লিয়াংয়ের চোখের পাতা আবার পিটপিট কেঁপে উঠল। ঢক করে ঘাড় নাড়ল শ্রীমান ঝাও লিয়াং।

"তোমার কাকার নাম কী, লিয়াং?"

"ঝিয়েন। আই মিন, ঝাও ঝিয়েন। ঝাও আমাদের ফ্যামিলি নেম।"

"মানে, আমরা যাকে বলি পদবি?"

"হ্যাঁ। অনেকটা তাই। আমাদের ফ্যামিলি নেমটা আসল নামের আগে থাকে।"

"ও। ... তোমার কাকার বয়স কত হয়েছিল?"

"ফরটিসেভেন।"

"তোমার কাকিমা আছেন তো?"

"কাকা বিয়ে করেননি। আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি, কাকা আমাদের সঙ্গেই থাকতেন। টেরিটি বাজারে একটা চাইনিজ় স্কুল আছে, অনেক বছরের পুরনো, কাকা ওখানেই পড়াতেন। হিস্ট্রি। পড়াশোনা নিয়েই থাকতেন সারাদিন। আমরা কাকাকে বলতাম 'বুকওয়ার্ম'। উনি আমাদের ... মানে বাড়ির ছোটদের কী ভাল যে বাসতেন! কত কিছু কিনে আনতেন আমাদের জন্য। এই তো ক'দিন আগেই আমার আর মেইলির জন্য হ্যারি পটারের সিডি নিয়ে এলেন ..."

"মেইলি কে?"

"আমার বোন। ছোট বোন। শি ইজ় ইন ক্লাস সিক্স।"

"ও।"

"মেইলি কাকার খুব পেট ছিল। ও এখনও খুব কান্নাকাটি করছে।

ইনফ্যাক্ট, কাকার ওভাবে মৃত্যুটা আমরা কেউই মেনে নিতে পারছি না। আমি, বাবা, মা ...”

বলতে-বলতে লিয়াংয়ের গলা ধরে এল। নাক টানছে। টুপুর ডায়েরিতে নোট নিতে নিতে থমকাল। দেখছে লিয়াংকে। রাস্তায় চিনা ছেলেমেয়েদের দেখলে কেমন ভাবলেশহীন মনে হয়, কিন্তু মোটেই এ তো তা নয়! লিয়াং একেবারে টুপুরদের মতোই আবেগপ্রবণ।

একটু সময় নিয়ে টুপুর আবার কলম ধরল, “এবার তা হলে আমরা মেন টপিকে আসি।”

কুশলও আর চুপ থাকতে পারল না। বলল, “হ্যাঁ, হেঁয়ালিটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। লিয়াং বলছে, ওর কাকার কাছে একটা জিনিস থাকার কথা ছিল। অথচ লিয়াংরা জানে না জিনিসটা কী। এটা কীরকম একটু শোনাচ্ছে না?”

লিয়াং বলল, “সত্যি জানি না রে। তবে কাকা বাড়িতে যা বলে বেরিয়েছিলেন, সেইমতো কাকার কাছে জিনিসটা থাকার কথা।”

“কিন্তু কী জিনিস?”

“তা হলে আর-একটু আগে থেকে বলি। দিন পনেরো আগে কাকা একদিন রাতে বাড়ি ফিরে বললেন, বেকবাগানের এক কিউরিও শপে তিনি অদ্ভুত একটা জিনিস দেখতে পেয়েছেন। জিনিসটা সম্ভবত খুব মূল্যবান। কাকা ঠিক করেছিলেন ওটা তিনি কিনে আনবেন। আর ওই জিনিসটাই নাকি হবে এবারের মুন ফেস্টিভ্যালে আমাদের বাড়ির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।”

টুপুর ডায়েরি থেকে চোখ তুলল, “মুন ফেস্টিভ্যালটা কী?”

কুশল আগ বাড়িয়ে বলে উঠল, “মুন ফেস্টিভ্যাল জানিস না? ... লিয়াংদের চাইনিজ় ক্যালেন্ডার তো আমাদের মতো নয়। ওদের বছর ঘোরে চাঁদের হিসেবে। অমাবস্যা টু অমাবস্যা এক মাস।

ফেব্রুয়ারি মাসের অমাবস্যার দিন ওদের নববর্ষ। আর সেই হিসেবে অষ্টম চান্দ্রমাসের ফিফটিনথ্ ডে'তে হয় ওদের মুন ফেস্টিভ্যাল। পূর্ণিমার দিন। ঠিক বলছি তো রে লিয়াং?"

"হান্ড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট।"

"সেদিন তো তোদের বাড়িতে বাড়িতে কেক বানানো হয়, তাই না? গত বছর তুই স্কুলে এনে খাইয়েছিলি, আমার মনে আছে। দেদার ড্রাই ফ্রুট্স ছিল কেকে। দারুণ টেস্ট।"

"আমরা ওই কেকটাকে বলি 'মুনকেক'। মুন ফেস্টিভ্যালের দিন রাত্তিরবেলা আমরা ওই কেক খাই। ... যাই হোক, কাকার কথায় আসি। আমরা তো খুব আশায় আশায় ছিলাম, কাকা একটা দারুণ কিছু আনবেন। কিন্তু পরদিন কাকা ফিরলেন বেশ গোমড়া মুখে। কেন? না কিউরিও শপের মালিক নাকি জিনিসটা বেচবেন না। আবার তার দু'-তিন দিন পরেই দেখি, কাকার মুখে হাসি। দোকানের মালিক নাকি শেষ পর্যন্ত দশ হাজার টাকায় জিনিসটা দিতে রাজি হয়েছেন।"

"তখনও তোমরা জানতে চাওনি জিনিসটা কী?"

"জিজ্ঞেস করেছিলাম। মেইলি তো কাকার কানের পোকা বের করে দিয়েছিল প্রায়। কিন্তু কাকা কিছুতেই বলেননি। খালি বলতেন, সারপ্রাইজ়, সারপ্রাইজ়, ধৈর্য ধরো। ... তারপর লাস্ট স্যাটারডে কাকা স্কুল থেকে বাবাকে মোবাইলে জানালেন, ছুটির পর জিনিসটা কিনে তবে উনি বাড়ি ফিরবেন। কাকার কলিগরা তো বাড়িতে এসেছিলেন, তাঁরাও বলেছেন কাকা ওই দিন দুটোতেই বেরিয়ে পড়েছিলেন। আর অ্যাকসিডেন্টটা ঘটেছে সন্ধেবেলায়। এই চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে কাকা কি আর জিনিসটা কিনে ফেলেননি?"

"এটা কিন্তু ঠিকঠাক বলা কঠিন।" টুপুর ভুরু কুঁচকোল,

"কিনতেও পারেন, না-ও কিনতে পারেন। ... সেই দোকান কী বলছে? কিউরিও শপ?"

লিয়াং যেন থমকাল একটু। ঢোক গিলে বলল, "দোকানে তো খবর নেওয়া হয়নি।"

"সে কী?"

"হ্যাঁ মানে ... আমি তো বেকবাগানের দিকটা ভাল চিনি না ... একা-একা যেতে সাহসও পাইনি। তা ছাড়া পোস্টমর্টেম, কাকাকে সমাধি দেওয়া, এসব করতেও তো চলে গেল দিন চারেক। বাড়িতেও সকলের মনের যা অবস্থা ..."

"স্ট্রেঞ্জ! জিনিসটা আদৌ কেনা হয়েছিল কিনা সেটা তো আগে জানবে," টুপুর গলা ভারী করল, "যাক গে, পুলিশকে বলেছ কাকার মৃত্যুটাকে তোমরা অ্যাকসিডেন্ট বলে মানতে পারছ না?"

"বাবা বলেছেন।"

"কেন মানতে পারছেন না, তা-ও বলেছেন নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ।"

"পুলিশ কী বলছে?"

"খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, কাকার কোনও এনিমি ছিল কিনা। এমন শত্রু, যে কিনা কাকাকে গাড়ি চাপা দিয়ে মারতে পারে।"

"আছে কি তেমন কেউ?"

"প্রশ্নই আসে না। আমার কাকা নিপাট ভালমানুষ। বললাম তো তোমাকে, কাকা বই আর পড়াশোনাতেই ডুবে থাকতেন। আমরা কখনও তাঁকে কারও সঙ্গে ঝগড়া পর্যন্ত করতে দেখিনি।"

"আর জিনিসটা হারানোর ব্যাপারে পুলিশের কী রিঅ্যাকশন?"

"দোকানের লোকেশানটা নিয়েছে। বলেছে, খোঁজ করে দেখবে।" লিয়াং চশমা ঠিক করল, "তবে বাবা বলছিলেন, পুলিশ

নিজে থেকে কিছুই করবে না। সারাক্ষণ ওদের পিছনে লেগে থাকতে পারলে, নিয়মিত তাড়া লাগালে, হয়তো একটু নড়াচড়া করবে, নইলে তা-ও করবে না। আর আমার বাবার পক্ষে ওদের পিছনে সব সময়ে ছোটাছুটি করা সম্ভবই নয়।"

"কেন?"

"দোকান সামলাতে হয় যে! তা ছাড়া বাবার মনটাও খুব ভেঙে গিয়েছে। বলছেন, আর কাটাছেঁড়া করে কী লাভ, আমার ভাই তো আর ফিরবে না।"

"তা হলে আমার মাসির খোঁজে এসেছ যে বড়?"

"সে তো আমি এসেছি। বাবা জানেনও না। ... আমি ব্যাপারটার শেষ দেখতে চাই। কাকাকে যদি সত্যিই কেউ মেরে থাকে, তাকে শাস্তি না দিয়ে আমি ছাড়ব না।"

লিয়াং আবার নাক টানছে। টুপুর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি শান্ত হও লিয়াং। আমি দেখছি কী করা যায়। তবে আমাদের একদম সিস্টেমেটিক্যালি এগোতে হবে। আমাদের প্রথম কাজ হল ..."

"আগে দোকানটায় যাওয়া।" টুপুরের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিল কুশল, "জানতে হবে জিনিসটা সত্যিই লিয়াংয়ের কাকা কিনেছিলেন কিনা।"

"এবং জিনিসটা কী ছিল।" টুপুর ফের কথা ধরে নিল, "যদি সত্যিই জিনিসটা মূল্যবান হয়, তখন তো খুনের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। তখন কিন্তু আমাদের লিয়াংয়ের বাড়িও যেতে হবে, সবাইকে কিছু প্রশ্নও করতে হবে। ... তোমার বাবা তখন কিছু মনে করবেন না তো, লিয়াং?"

নাক কুঁচকে দু'-এক সেকেন্ড কী যেন ভাবল লিয়াং। তারপর বলল, "নো প্রবলেম। আমি বাবাকে সব বুঝিয়ে বলব।"

"গুড।" টুপুর কুশলের দিকে ফিরল, "কাজে তা হলে নেমে পড়া যায়, কী বল?"

"অবশ্যই। আমিও তোর সঙ্গে আছি," কুশল একগাল হাসল, "আমার প্রচুর ডিটেকটিভ বই পড়া আছে। আমার অ্যাডভাইস নিলে তিন দিনে কেস সল্‌ভ হয়ে যাবে।"

মনে মনে হাসল টুপুর। রহস্যগল্প পড়েই যদি ডিটেকটিভ হওয়া যেত, তা হলে তো মিতিনমাসি নয়, পার্থমেসোই কবে গোয়েন্দা বনে যেত। ডিটেকটিভ হতে গেলে একটা তিন নম্বর চোখ থাকা দরকার। সেই চোখ বই পড়ে গজায় না। যাক গে, তবু কুশল থাকলে ক্ষতি নেই। লোকবলেরও তো মূল্য আছে।

মুখে একটা প্রাজ্ঞ ভাব ফুটিয়ে টুপুর বলল, "তা হলে দোকানে আমরা কবে যাচ্ছি?"

কুশল বলল, "শুভস্য শীঘ্রম। আজই চল।"

"দুর, আজ তো রবিবার। দোকান বন্ধ থাকবে। আমরা যাব কাল। বিকেলে। ... লিয়াং, তুমি বরং কাল স্কুল থেকে কুশলদের বাড়ি চলে এসো। আমি তোমাদের ডেকে নেব।"

লিয়াং বেশ অনুপ্রাণিত হয়েছে। জ্বলজ্বলে চোখে বলল, "তাই হবে।"

লিয়াং আর কুশল চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে এলেন সহেলি। ঘটনাটা অর্ধেক শুনেই হাঁ হাঁ করে উঠেছেন, "না না, তোর ওসবের মধ্যে থাকার দরকার নেই। একে খুনখারাপির ব্যাপার, তায় আবার এক চিনাম্যান জড়িত, কোত্থেকে কী হয়ে যায়!"

অবনী বললেন, "চিনেম্যান তো কী আছে? ওরা কি খুনে-বদমাইশ নাকি? তোমার বোধহয় জানা নেই, চিনারাই পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য জাতি। কত কী যে ওরা আবিষ্কার করেছে, তার ঠিকঠিকানা নেই। এই যে তুমি চা খাচ্ছ, এটাও ওদের অবদান।

কাগজ পড়ছ ... এটাও ওদের আবিষ্কার। কাগজ কী করে ছাপতে হয়, সেটাও ওরাই শিখিয়েছে। আর চিনে খাবার দেখলে তোমার তো জিভে জল গড়ায়।"

"থাক, আর চিনাদের গুণ ব্যাখ্যান করতে হবে না। মেয়ের একটা কিছু বিপদ হোক, তখন দেখব তোমার লেকচার কোথায় থাকে!"

"আহা, আগেই ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? টুপুর তো আর কেসটা করছে না, মাসির হয়ে প্রক্সি দিচ্ছে শুধু। যদি কেসটার মেরিট থাকে, মিতিনই তো মাঠে নেমে পড়বে।"

বাবার সমর্থন পেয়ে টুপুরেরও গলার জোর বেড়েছে। সহেলিকে বলল, "তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি, মা। তুমি কি চাও আমি ঘরকুনো হয়ে বসে থাকি?"

অবনী বললেন, "মাকে ওভাবে বলতে নেই টুপুর। তোর মা'র ভয় পাওয়ার একটু-একটু কারণও তো আছে। এই যে চিনারা, এরা আমাদের শহরে কতকাল ধরে আছে জানিস? দুশো বছরেরও বেশি। সেই ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকে। ভারতের কোনও শহরে এত চাইনিজ় নেই। কলকাতায় এখন এদের সংখ্যা প্রায় কুড়ি হাজার। অথচ কী আশ্চর্য, ভাব তুই, এত বছর ধরে এত লোক আমাদের প্রতিবেশী হয়ে থাকা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু সেভাবে তাদের চিনিই না। তাদের রীতিনীতি আদবকায়দা, উৎসব-পার্বণ, কোনও কিছুরই খবর রাখি না। আর এই না-চেনা থেকেই তো তৈরি হয় আশঙ্কা, রহস্য, ভয়।"

"তা অবশ্য ঠিক। এই তো, ওদের মুন ফেস্টিভ্যালের নামই আমি জন্মে কখনও শুনিনি।"

"আমি অবশ্য খানিকটা জানি। ওদের মুন ফেস্টিভ্যাল অনেকটা আমাদের নবান্নের মতো। ফসল কাটার পরে চিনদেশে এই উৎসবটা হত। এখনও হয়। কলকাতার চিনারাও ট্র্যাডিশনটা বজায় রেখেছে।

ওই দিন চিনারা যে মুনকেক খায়, তাই নিয়েও একটা ইন্টারেস্টিং গল্প আছে।”

“তাই নাকি?”

“হ্যাঁ রে। চেঙ্গিস খাঁর নাতি কুবলাই খাঁ থারটিনথ্ সেঞ্চুরিতে চিন দখল করে নিয়েছিল। তখন ওখানকার সাধারণ লোকদের মনে একটা বিদ্রোহের ভাব জেগে ওঠে। এই মুন ফেস্টিভ্যালের দিনই প্রথম মুনকেক বানিয়ে তার মধ্যে কাগজ পুরে পুরে বিপ্লবীরা দেশময় খবর চালাচালি করেছিল। এখনও তাই চিনারা মুনকেককে বিপ্লবের প্রতীক হিসেবে মনে করে।”

বাঃ, এটা তো একটা ভাল তথ্য যোগ হল টুপুরের মগজের ভাঁড়ারে। লিয়াংয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয়টা বাড়লে চিনাদের সম্পর্কে আরও কিছু জানা যাবে নির্ঘাত।

কিন্তু লিয়াংদের কেসটা কী? ঝোঁকের মাথায় দায়িত্ব তো নিয়ে ফেলল টুপুর, শেষ পর্যন্ত সামাল দিতে পারবে তো? ইস, কুশল আর লিয়াংয়ের চোখে সে হাসির খোরাক না হয়ে যায়।

দোকানটা বেকবাগানের মোড়েই। নাম ‘গ্র্যান্ড কিউরিও শপ’। খুব-একটা বড় নয়, তবে নানারকম বাহারি জিনিসপত্রে ঠাসা। রয়েছে অজস্র ধরনের রঙিন চিনেমাটির পুতুল, পাথরের ছোটখাটো মূর্তি, সাবেকি ফুলদানি, খুদে ঝাড়লণ্ঠন। সঙ্গে ফেং-শুই আইটেমও রয়েছে বেশ কিছু। উইন্ডচাইম, লাফিং বুদ্ধা, লাভবার্ডস্। কাচের শোকেসের ওপারে, দোকানে ঝোলানো স্ফটিকগুলো ঝকঝক করছে।

বাইরে থেকে দোকানের ভিতরটা দেখছিল টুপুররা। ঢুকবে কি ঢুকবে না ইতস্তত করছিল তিন মূর্তি। দোকানে কোনও ক্রেতা নেই এখন, কাউন্টারে বসে আছেন এক মধ্যবয়সি মানুষ। মাথা নিচু করে লিখছেন কী যেন। সম্ভবত হিসেবটিসেব।

টুপুর একটা বড়সড় শ্বাস ভরে নিল বুকে। কুশলকে বলল, "আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে, আয়, কপাল ঠুকে ঢুকে পড়ি।"

তিন মূর্তি কাচের দরজা ঠেলতেই চোখ তুলেছেন ভদ্রলোক। হাসিহাসি মুখে বললেন, "কী নেবে ভাই তোমরা?"

কুশল গলা ঝেড়ে বলল, "আমরা একটু আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"কী কথা?"

লিয়াংকে দেখিয়ে টুপুর বলল, "আমাদের এই বন্ধুর কাকা আপনাদের দোকান থেকে একটা জিনিস কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরশু শনিবারের আগের শনিবার।"

"কী জিনিস?"

"সেটা তো আমরা ঠিক জানি না ... মানে সেটা জানতেই আসা ..."

দু'-চার সেকেন্ড ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে রইলেন ভদ্রলোক। তার পরেই মুখভাব হঠাৎ বদলে গিয়েছে। লিয়াংকে আপাদমস্তক জরিপ করে নিয়ে বললেন, "তোমারই কাকা মারা গিয়েছেন বুঝি?"

লিয়াং মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"পুলিশ তোমাদের কিছু জানায়নি? পুলিশ তো আমার দোকানে এসেছিল, তাদের তো আমি বলে দিয়েছি উনি কী কিনেছিলেন।"

"এখনও থানা থেকে আমাদের কিছু বলেনি।"

"ও," ভদ্রলোক একটুক্ষণ কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, "তোমার কাকাকে আমি একটা ওয়ালহ্যাঙ্গিং বিক্রি করেছিলাম।"

টুপুর বলল, "ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা কীরকম ছিল যদি একটু বলেন ..."

"বড়সড় একটা ক্যালেন্ডারের মতো দেখতে। কাপড়ের। খুবই পুরনো। হলদেটে কাপড়ের উপর কী সব আঁকাজোকা ছিল। আর চিনে ভাষায় লেখাও ছিল কিছু।"

"কী লেখা ছিল?"

"সে আমি কী করে বলব? আমি কি চিনে ভাষা পড়তে পারি? সত্যি বলতে কী, ওটা যে চাইনিজ় লেখা তা-ও আমি জানতাম না। আমার ধারণা ছিল, ওগুলো ছোট ছোট ছবি। ওই চিনা ভদ্রলোকই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছিলেন, তাই দেখে আমি বুঝতে পারলাম।"

"উনি কি আপনাকে বলেছিলেন কী লেখা আছে?"

"নাঃ। শুধু বলেছিলেন, এটা খুব ইন্টারেস্টিং পিস, মনে হচ্ছে আমার রিসার্চের কাজে লাগবে। ... ও হ্যাঁ, আর-একটা কথাও বলেছিলেন। ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা কার যেন আঁকা ... কী যেন নাম ... মো ... মো ... দুর ছাই, নামটা মনে আসছে না।"

"পুলিশকে বলতে পেরেছিলেন নামটা?"

"উঁহু। শুধু ওই মো-টুকুই মনে আছে।"

"ও। যদি আপত্তি না থাকে, আর-একটা প্রশ্ন করব? আমরা শুনেছি, আপনি নাকি গোড়ায় ওটা বিক্রি করতে চাননি। কারণটা জানতে পারি?"

ভদ্রলোককে এবার বেশ গম্ভীর দেখাল, "এ-কথা কে বলল তোমাদের?"

লিয়াং বলল, "আমার কাকাই বাড়িতে গল্প করেছিলেন।"

"উম্," আবার কথা বলতে সামান্য সময় নিলেন ভদ্রলোক, "সত্যিই ওটা বেচার আমার ইচ্ছে ছিল না। অবশ্য কোনও স্পেসিফিক কারণ নেই। জাস্ট একটা প্রাচীন-প্রাচীন লুক আছে বলে দোকানেই সাজিয়ে রেখেছিলাম।"

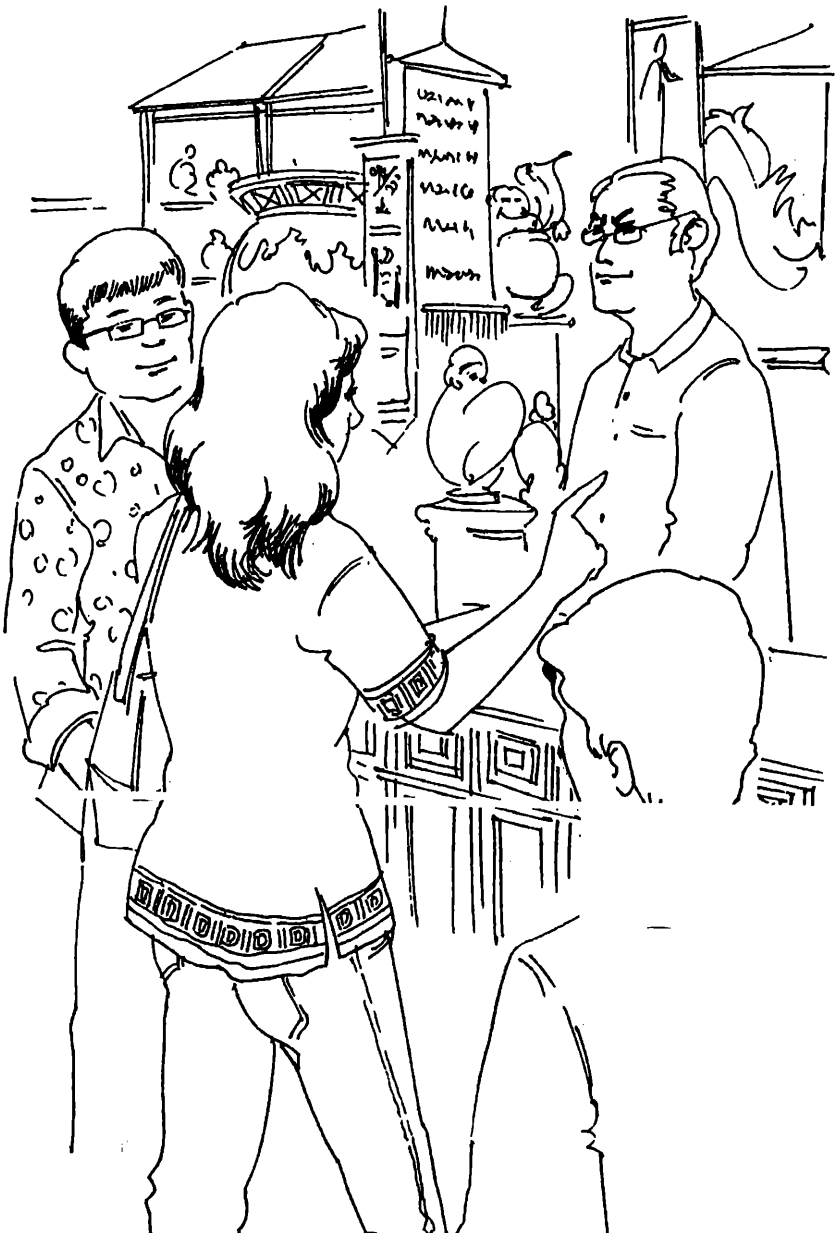

"পরে তা হলে ডিসিশন বদল করলেন যে?"

"ভদ্রলোক বারবার এসে চাইছিলেন...আমিও ভাবলাম, যদি কাজে লাগে তো দিয়েই দিই..."

কুশল ফস করে বলে উঠল, "তার জন্য আপনি দশ হাজার টাকা দরও হেঁকে বসলেন..."

"তাতে তোমার কী হে?" ভদ্রলোক এবার চটে গেলেন দুম করে, "ডেঁপোমি কোরো না। বাচ্চা ছেলে, বাচ্চা ছেলের মতো থাকো। জিনিসটা আমি দশ হাজারে বেচেছি, না দশ লাখে, তার হিসেব আমি তোমায় দেব কেন? যদি বলি জিনিসটা বিনা পয়সায় দিয়ে দিয়েছি, তা হলেও কি তোমার কিছু বলার আছে?"

"আহা, আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন আঙ্কল?" টুপুর তাড়াতাড়ি হাল ধরল, "আমার বন্ধু খারাপ সেন্সে কিছু বলেনি। ও শুধু জানতে চাইছিল, দশ হাজার টাকা দাম পেয়েই কি আপনি জিনিসটা বেচতে রাজি হলেন?"

"আমি এই প্রশ্নের জবাব দেবই না।" ভদ্রলোকের গোলগাল মুখখানা থমথম করছে, "জিনিসটা বেচে আমি অপরাধী হয়ে গিয়েছি নাকি? একবার পুলিশ এসে জেরা করবে, একবার তোমরা এসে সাড়ে-সতেরোখানা প্রশ্ন হানবে..."

"প্লিজ আঙ্কল, আপনি অন্যভাবে নেবেন না। আসলে, জিনিসটা কেনার পরেই লিয়াংয়ের কাকা মারা গেলেন তো..."

"এবং ওয়ালহ্যাঙ্গিংটাও ভ্যানিশ হয়ে গেল..."

"অ্যাই, অ্যাই, তোমরা কী বলতে চাও, অ্যাঁ?" ভদ্রলোকের নাকের পাটা ফুলে উঠল, "আমার দোকান থেকে কিছু কেনার পর কোনও কাস্টমারের যদি অ্যাকসিডেন্ট হয়, তার জন্য আমি দায়ী? তার কাছ থেকে যদি কিছু খোওয়া যায়, তাতেই বা আমার করার কী আছে? আর তোমাদের আমি এত কৈফিয়তই বা কেন দেব, অ্যাঁ?"

কুশল পালটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, টুপুর চোখের ইশারায় তাকে থামাল। নিজেও চুপ করে গিয়েছে। নিরীক্ষণ করছে দোকানের মালিককে। ভদ্রলোকের মুখচোখে কেমন যেন অস্থির-অস্থির ভাব। টুপুররা তো এমন কিছু আজেবাজে প্রশ্ন করেনি, অথচ ভদ্রলোক খেপে গেলেন। কেন? পুলিশ কি এসে খুব চোটপাট করে গিয়েছে?

দু'জন খদ্দের ঢুকেছে দোকানে। স্বামী-স্ত্রী। ভদ্রলোক পলকে সামলে নিয়েছেন নিজেকে। টুপুরদের ছেড়ে তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পটাপট আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন। আরও ঝলমল করে উঠল দোকান। ঘুরে ঘুরে হরেক রকমের উইন্ডচাইম দেখাচ্ছেন। টুংটুং, টিংটাং বাজনায় দোকান মুখর। শুধু বাতাসি ঘণ্টাই নয়, একটা হাস্যমুখ বুদ্ধমূর্তিও পছন্দ করল স্বামী-স্ত্রী। দরাদরির কোনও বালাই নেই, করকরে সাতশো টাকা দিয়ে, প্যাকেট বগলদাবা করে বেরিয়ে গেল দু'জনে।

ক্যাশবাক্সে টাকা রাখলেন দোকানের মালিক। মেজাজ ঈষৎ প্রসন্ন যেন। তেরচা চোখে বললেন, "কী হল, তোমরা এখনও দাঁড়িয়ে আছ যে?"

টুপুর মুখটা কাঁচুমাচু করে বলল, "এমনিই। ...আপনার মনে কষ্ট দিয়ে ফেললাম, তাই 'সরি' বলার জন্য ওয়েট করছি।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে।" ভদ্রলোকের কাঁচাপাকা গোঁফের ফাঁকে একফালি হাসি উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। নরম স্বরে লিয়াংকে বললেন, "শোনো ভাই, তোমার কাকার মৃত্যুসংবাদে আমি সত্যি খুব দুঃখিত হয়েছি। ওঁর সঙ্গে আমার কতটুকুই বা পরিচয়! দু'-চার দিন দোকানে এসেছেন, দুটো-চারটে কথা বলেছেন, ব্যস। তাতেই ভদ্রলোককে আমার বেশ লেগেছিল। শান্ত ধরনের মানুষ... ভেরি লাইকেব্‌ল ফেলো।"

লিয়াং মৃদু গলায় বলল, "আমার কাকাকে সবাই লাইক করত।

সেই জন্যই তো ভেবে পাচ্ছি না কে তাঁকে ওভাবে মারল!"

"আহা, ইচ্ছে করে কেউ মেরে দিয়েছে, এমনটাই বা ভাবছ কেন? ভাল মানুষরা গাড়িচাপা পড়েন না? আর ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা হয়তো এদিক ওদিক পড়ে ছিল, রাস্তার কেউ তুলে নিয়ে গিয়েছে।"

"কিন্তু ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা নিয়ে কাকার তো বাড়ি ফেরার কথা। তিনি প্রিন্সেপ ঘাটের দিকে যাবেনই বা কেন?"

"সেটা তো আমি বলতে পারব না। দ্যাখো, পুলিশের তদন্তে কী বেরোয়।"

টুপুর বলল, "আঙ্কল, আর-একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

"আবার কী প্রশ্ন?"

"আপনি কি জানতেন ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা খুব মূল্যবান? দশ হাজার টাকা দামও হতে পারে?"

"বারবার দশ হাজার, দশ হাজার করছ কেন? দাম নিয়ে আমি কোনও কথাই বলব না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা। ...আর একটা কোয়েশ্চেন, আঙ্কল। ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা কদ্দিন ধরে আপনার দোকানে ঝুলছিল?"

"রিসেন্টলিই এনে রেখেছিলাম। দেড়-দু'মাস হল।"

"পেয়েছিলেন কোত্থেকে? ...মানে কারও কাছ থেকে কিনে সাজিয়েছিলেন, নাকি...?"

"ওটা আমার বাড়িতেই ছিল। বহুকাল ধরে।"

কুশল বলে উঠল, "আশ্চর্য! বহুকাল ধরে বাড়িতে ছিল... অথচ দেড়-দু'মাস আগে দোকানে টাঙিয়েছিলেন... কেমন কেমন শোনাচ্ছে না?"

"অ্যাই, কী মিন করতে চাইছ তুমি, অ্যাঁ? আমার জিনিস আমি ঘরে রাখি, দোকানে টাঙাই, তাতে তোমাদের কী?"

"কিছুই না। তবে শেষ পর্যন্ত মোটা টাকায় বেচে দিলেন তো?"

"চোপ। বেশ করেছি বেচেছি।" ভদ্রলোক ঝপ করে ফের তেতে গিয়েছেন, "যাও তো, ভাগো তো এবার। একে খদ্দেরটদ্দের নেই, তার উপর কোত্থেকে যত উটকো আপদ এসে...! আউট। আউট।"

ভদ্রলোকের হম্বিতম্বির ধাক্কাতেই টুপুররা প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল বাইরে। ফুটপাত থেকেই দেখল ভদ্রলোক এখনও কটমট চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎই পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে কার সঙ্গে যেন কথা বলা শুরু করেছেন। বাতচিত চালাতে চালাতেও দৃষ্টি টুপুরদের দিকে।

টুপুর চাপা গলায় বলল, "চল, সরে যাই।"

দু'-চার পা গিয়েও কুশল দাঁড়িয়ে পড়ল। উত্তেজিত গলায় বলল, "ভদ্রলোককে ছেড়ে দেওয়া বোধহয় উচিত হল না। আর-একটু বাজানোর দরকার ছিল।"

লিয়াং মাথা দুলিয়ে বলল, "ইয়েস। লোকটাকে আমার যথেষ্ট সাসপিশাস মনে হচ্ছে। কাকার অ্যাকসিডেন্টের পিছনে ওর একটা হাত থাকলেও থাকতে পারে।"

কুশল মুঠো ঝাঁকিয়ে বলল, "অবশ্যই। জিনিসটা বিক্রি করার পরই হয়তো মনে হয়েছে কাজটা ভুল হয়ে গেল। আরও বেশি দামে জিনিসটা বেচা যেত। তাই হয়তো ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা ফের হাতানোর জন্য অ্যাকসিডেন্টটা ঘটিয়েছে।"

টুপুর হেসে ফেলল, "তার মানে দাঁড়াচ্ছে, জিনিসটা বেচার পরেই ভদ্রলোক লিয়াংয়ের কাকাকে মারতে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন?"

"নিজে যাবেন কেন? লোকও তো লাগাতে পারেন।"

"বেশ। তাই না হয় হল। কিন্তু লিয়াংয়ের কাকা বাড়ি না-ফিরে প্রিন্সেপ ঘাটেই বা গেলেন কেন? যাতে কেউ তাঁকে ফাঁকা জায়গায় নিশ্চিন্তে গাড়িচাপা দিতে পারে?"

কুশল একটু দমে গেল এবার। বেলা পড়ে এসেছে, সন্ধে নামছে শহরে। আনমনে একবার আকাশের দিকে তাকাল কুশল। তারপর ভুরু কুঁচকে বলল, "তুই আমার আইডিয়াটাকে পাত্তা দিচ্ছিস না, টুপুর? আমি কিন্তু এরকম একটা কেস পড়েছি। জুয়েলারির মালিক একটা হিরের নেকলেস বিক্রি করার পর নিজের কাস্টমারকে খুন করিয়ে গয়নাটা আবার নিয়ে নিচ্ছে। কেউ তাকে সন্দেহ করেনি, কিন্তু ডিটেকটিভ ঠিক ধরে ফেলেছিল। মনে রাখবি টুপুর, যাকেই তুই সন্দেহের তালিকার বাইরে রাখবি, সে-ই কিন্তু সম্ভাব্য অপরাধী।"

"বুঝলাম। কিন্তু প্রিন্সেপ ঘাটে যাওয়াটা....?"

"কারণটা খুঁজতে হবে। সেটাই তো ডিটেকটিভের কাজ।"

টুপুর আর তর্কে গেল না। তবে কিউরিও শপের মালিককেও একেবারে ঝেড়ে ফেলল না চিন্তা থেকে। আরও অনুসন্ধান দরকার। লিয়াং বলছে, তার কাকা অজাতশত্রু। তা হলে তাঁকে কেউ মারবে কেন? ওই ওয়ালহ্যাঙ্গিংটাই কি একমাত্র কারণ? ভাল করে খতিয়ে না-দেখে নিশ্চিত হওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? লিয়াংদের পরিবারের মধ্যেই কোনও গন্ডগোল নেই তো? কোনও জ্ঞাতিশত্রুতা? সম্পত্তি-টম্পত্তির জন্য? কিংবা অন্য কিছু, যা টুপুর এখনও জানে না?

চিন্তিত স্বরে টুপুর বলল, "মনে হচ্ছে একবার লিয়াংদের বাড়িতে যেতেই হবে।"

লিয়াং বলল, "কবে যাবে বলো?"

"দেখি। রাত্তিরে ফোন করে তোমায় জানিয়ে দেব।"

কুশল বলল, "আমার কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে ওই দোকানদার ভদ্রলোকই কোনও ফাউল প্লে করেছে। ভদ্রলোককে ভাল করে চেপে ধরতে পারলেই সত্যিটা বেরিয়ে আসবে।"

টুপুর অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল, "দরকার হলে তা-ও করা যাবে।"

লালবাজার পার হয়ে, বাঁ ফুটপাত ধরে, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের দিকে একটুখানি হাঁটলেই ছাতাওয়ালা গলি। লিয়াং রাস্তাটার মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল, টুপুরদের দেখে হাত তুলল, "হাই! তোমরা এত লেট করলে কেন?"

কুশল বলল, "আর বলিস না, বাড়ি ফিরে স্কুল-ইউনিফর্ম চেঞ্জ করে টুপুরকে ডাকতে গেলাম... টুপুরও রেডি হল... তারপর বাস... ট্রাফিক জ্যাম..."

"ও কে। ও কে। তাড়াতাড়ি চলো। বাবা কিন্তু আর বেশিক্ষণ বাড়ি থাকবেন না।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "দোকানে যাবেন বুঝি?"

"হ্যাঁ। বাবা দুপুরে খেতে আসেন তো, তারপর একটু রেস্টফেস্ট নিয়ে বেরোন। মা ততক্ষণ দোকান সামলান।"

"তোমাদের দোকানটা কীসের, সেটা কিন্তু জানা হয়নি, লিয়াং।"

"সরি। আমারই বলা উচিত ছিল।" লিয়াং হাঁটা শুরু করেছে। হাঁটতে হাঁটতে বলল, "আমাদের লন্ড্রির বিজনেস। মিশন রো-তে। বহু দিনের পুরনো ব্যবসা। আমার ঠাকুরদার বাবা স্টার্ট করেছিলেন।"

"ওরেব্বাস্! তার মানে সত্তর-আশি বছর আগেকার?"

"হিসেব করলে দেখা যাবে, তারও অনেক অনেক বছর আগের। আমাদের ফ্যামিলি বংশানুক্রমে এই বিজনেস করছে। কবে যে শুরু

হয়েছিল, বলা কঠিন। বাবার মুখে শুনেছি, সাংহাইতেও নাকি আমাদের লন্ড্রি ছিল।"

কুশল অবাক মুখে বলল, "তোরা সাংহাইয়ের লোক? আমার ধারণা ছিল কলকাতার চাইনিজ়রা সবাই বুঝি ক্যান্টন থেকে এসেছেন।"

"না রে। আমাদের কমিউনিটিতে নানান জায়গার লোক আছে। কেউ এসেছিল হাক্কা থেকে, কেউ বা হুপে। অবশ্য সংখ্যায় ক্যান্টনের লোকই বেশি।"

টুপুর বলল, "আমি বোধহয় এই বিষয়ে একটু একটু জানি।"

"কী রকম?"

"এই যেমন ধরো, তোমরা চিনারা অনেকেই এ-দেশে এসেও নিজের নিজের বিজ়নেসই বজায় রেখেছ। তোমাদের এক-এক জায়গার লোকরা এক-একটা ব্যবসায় ওস্তাদ। যেমন ক্যান্টনিরা কাঠের কাজ করেন, কিংবা হোটেল-রেস্টুরেন্ট চালান। আর যত চিনা ডেন্টিস্ট আছেন, তাঁরা সবাই এসেছিলেন হুপে থেকে। আর হাক্কারা, মানে চিনে যাঁদের স্থায়ী বাসস্থান ছিল না, তাঁরা করেন চামড়ার ব্যবসা।"

"বাঃ, তোমার জি কে তো দারুণ!" লিয়াং মুগ্ধ হয়েছে, "আমার অবশ্য লন্ড্রিতে বসার একটুও ইচ্ছে নেই। আমি টিচিং লাইনে যাব। আমার কাকার মতো।"

কথায় কথায় অনেকটা পথ চলে এসেছে টুপুররা। ছাতাওয়ালা গলি এঁকেবেঁকে চলেছে তো চলেছেই। রাস্তায় এখন বেশ চিনা মুখ দেখা যায়। মোটরসাইকেল হাঁকিয়ে ছুটে গেল দুই চিনা যুবক। হাতে-টানা রিকশায় চড়ে চিনা গৃহিণী কেনাকাটা সেরে ফিরছেন। স্কুল-ইউনিফর্ম পরা একদল চিনা মেয়ে কলকল করতে করতে চলে গেল পাশ দিয়ে। একটা-দুটো স্টেশনারি দোকানও আলো করে বসে

আছেন চিনা দোকানদার। অন্যান্য মানুষ দেখা গেলেও পাড়াটা যে চিনাদের, বুঝতে অসুবিধে হয় না।

মূল রাস্তা ছেড়ে একটা গলিতে ঢুকল লিয়াং, সেখান থেকে আর একটা সরু গলি। অবশেষে একখানা পুরনো-পুরনো বাড়ির সামনে এসে থেমেছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "ওয়েলকাম টু আওয়ার প্লেস। একটু দেখে দেখে এসো। আমাদের এন্ট্রান্সটা কিন্তু অন্ধকার-অন্ধকার।"

টুপুরের অবশ্য অত অন্ধকার লাগল না। সে থাকে হাতিবাগানে, প্রচুর পুরনো পুরনো বাড়ি তার দেখা। তুলনায় এ-বাড়ির ভিতরটায় যথেষ্ট আলো। তবে মাথায় রং-বেরঙের কাচ বসানো দরজা, নকশাদার সবুজ সানশেড লাগানো জানলা, আর বারান্দার স্যান্ডকাস্টিং করা রেলিং ঘোষণা করছে বাড়ির বয়স একশো পেরিয়েছে বহুকাল।

সরু সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে, লম্বা প্যাসেজ পেরিয়ে লিয়াংদের ফ্ল্যাট। বড়সড় ড্রয়িংরুমের সোফায় টুপুরদের বসিয়ে অন্দরে গেল লিয়াং। দিব্যি সাজানো-গোছানো ঘর। টিভি, টেলিফোন, শোকেস, ক্যাবিনেট, কী নেই ড্রয়িংরুমে। পেল্লাই উঁচু সিলিং থেকে লম্বা লম্বা ডাঁটি বেয়ে ঝুলছে ফ্যান, রংদার বাহারি ল্যাম্পশেড। দরজা-জানলায় সিল্কের পরদা। দেওয়ালে দু'খানা বড়-বড় বাঁধানো ছবি দৃশ্যমান। একটা ল্যান্ডস্কেপ। সম্ভবত কোনও বিখ্যাত চিনা শিল্পীর মূল ছবির নকল। অন্য ছবিটি সান-ইয়েৎ-সেনের। শোকেসে বার্বিডলের পাশে চিনামাটির পুতুল, ফুলদানি। টিভির মাথায় ছোট্ট ছোট্ট সফ্‌ট টয়। একখানা পিতলের উইন্ডচাইমও ঝুলছে ঘরে। ফ্যানের হাওয়া পেয়ে শব্দ বাজিয়ে দুলছে।

টুপুর চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল ঘরখানা। গৃহসজ্জা সাবেকি

ধাঁচের হলেও মোটের উপর রুচিশীল। চৈনিক সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি মিশে আছে কি? নাকি ব্রিটিশ?

কুশল কেমন বেজার মুখে বসে। হঠাৎই চাপা স্বরে বলল, "ইস, খ্যাটনটা আজ মিস হয়ে গেল রে। আগেরবার যখন এসেছিলাম, আন্টি কত কিছু খাইয়েছিলেন। একদম অরিজিনাল চাইনিজ রান্না।"

টুপুর ভুরু কুঁচকে বলল, "সাংহাই তো চিনের নর্দার্ন সাইডে। উত্তর চিনের লোকেরা তো সেদ্ধ সেদ্ধ খাবার খায়।"

"হ্যাঁ, আন্টির রান্নাতেও তেল বেশ কম ছিল। কিন্তু হেভি টেস্টি। রাইস নুড্‌লসের একটা প্রিপারেশান খাইয়েছিলেন, এখনও জিভে লেগে আছে। আর-একটা সুপ ... লেটুসটেটুস দিয়ে ..."

টুপুর হেসে ফেলল, "কী আর করা, আন্টি আজ যখন নেই ..."

কথার মাঝেই বাবাকে নিয়ে লিয়াংয়ের প্রবেশ। সঙ্গে লিয়াংয়ের বোনও রয়েছে। মেইলি। ভারী মিষ্টি দেখতে মেয়েটা। পুতুল-পুতুল। চেরা চেরা নীলচে চোখ, ফোলা ফোলা ফরসা গাল, চুল টেনে ঝুঁটি করে বাঁধা। ঝুঁটিতে নীল রঙের এক টুকরো উল লাগানো আছে। লিয়াংয়ের বাবার রং অবশ্য অতটা উজ্জ্বল নয়, হলদেতে তামাটে ছোঁওয়া। টুপুরের ধারণা ছিল, চিনারা ছোটখাটো হয়, লিয়াংয়ের বাবা কিন্তু বেশ লম্বা-চওড়া। পরনে নেভি-ব্লু ট্রাউজার আর ঘিয়ে রং বুশশার্ট। লিয়াংয়ের মতো লিয়াংয়ের বাবার হাতেও একটা কালো ব্যান্ড।

টুপুর আর কুশল উঠে বাও করেছিল, লিয়াংয়ের বাবাও মাথা ঝোঁকালেন। ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন, "আমি ভেবেছিলাম, তুমি আর-একটু বড় মেয়ে। এখন দেখছি, একেবারেই ছোট। আমাদের লিয়াংয়ের মতো।"

টুপুর হাসল, "আমাদের তো সেম ক্লাস আঙ্কল। স্কুলটাই যা আলাদা।"

"লিয়াং বলছিল, তুমি নাকি খুব সাহসী মেয়ে! তোমার ডিটেকটিভ আন্টির অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করো!"

"ওই আর কী। করি মাঝে মাঝে।"

"তোমার কি মনে হয় ঝিয়েনের কেসটা ... মানে আমার ভাইয়ের কেসটা তোমরা সল্‌ভ করতে পারবে?"

"চেষ্টা তো করব। কিন্তু তার আগে তো আঙ্কল আমাদের জানতে হবে, ওই ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা সত্যি মূল্যবান ছিল কিনা।"

"নিশ্চয়ই ছিল। নইলে কি ঝিয়েন ওটা কেনার জন্য অত ছটফট করে?" লিয়াংয়ের বাবা সোফায় বসলেন, "আমার ভাই মোটেই অকারণে দশ হাজার টাকা নষ্ট করার বান্দা ছিল না।"

টুপুর বলল, "লিয়াং তো কিছুই বলতে পারল না। ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা সম্পর্কে আপনার ভাই আপনাকে কিছু বলেছিলেন কি?"

"আকাশের পাখি মাটির প্রাণীর সঙ্গে কী কথা বলবে? একে অপরের ভাষা বোঝে কি?"

টুপুরের ঠিক বোধগম্য হল না কথাটা। অবাক মুখে লিয়াংয়ের দিকে তাকাচ্ছে।

লিয়াং তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "পাপা বলতে চাইছেন, তাঁরা দুই ভাই দুটো আলাদা জগতের মানুষ। একজন অনেক উঁচুতে বিচরণ করতেন, আর-একজন আর পাঁচটা মানুষের মতো সাধারণ। কাকার সঙ্গে পাপার তাই কোনও বিষয় নিয়েই বড় একটা আলোচনা হত না।"

কথায় কী হেঁয়ালি, বাপ্‌স। এই ভাষায় ভদ্রলোক যদি উত্তর দিতে থাকেন, টুপুরকে তো তা হলে চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে ফিরতে হবে।

টুপুর নার্ভাস গলায় বলল, "অর্থাৎ ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা কেমন ছিল, তা আপনার অজানা। তাই তো?"

"সেরকমটা হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।" লিয়াংয়ের বাবা সোজা হয়ে বসলেন, "তবে এই বিষয়টা নিয়ে কেন যেন ঝিয়েন আমার সঙ্গে কিছুটা আলোচনা করেছিল। বলেছিল, ওই এক টুকরো কাপড় নাকি আমাদের জানা ইতিহাসের অনেকটাই বদলে দেবে।"

"তাই বুঝি? কীভাবে?"

"তা তো বলতে পারব না। আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, ঝিয়েনের মতো পণ্ডিত তো নই।" হঠাৎই লিয়াংয়ের বাবার স্বর বুঁজে এল। ধরা ধরা গলায় বললেন, "এত পড়াশোনা ... এত জ্ঞান ... কী হল শেষ পর্যন্ত? মাটির নীচে যাওয়ার আগে পৃথিবীতে পঞ্চাশটা বসন্তও তো দেখতে পেল না বেচারা।"

"উনি তো শুনলাম প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে গবেষণাও করছিলেন?"

"হ্যাঁ। ইতিহাসই ছিল ওর নেশা। কত লাইব্রেরিতে যে ছুটে ছুটে বেড়াত। সপ্তাহে তিনদিন আলিপুরের ন্যাশনাল লাইব্রেরি তো বাঁধা। স্কুল ছুটির পর সটান চলে যেত, লাইব্রেরি বন্ধ না-হওয়া অবধি বসে থাকত বই মুখে করে। কত বিদ্বান মানুষদের সঙ্গে যে আলাপ ছিল ওর।"

"তাঁরাও কি চাইনিজ়?"

"না। বেশির ভাগই বাঙালি। ঝিয়েনের সাবজেক্টেরই লোক। তাঁদের দু'-তিন জনের সঙ্গে তো প্রায় রাতেই কথা বলত টেলিফোনে।"

কুশল গলা ভারী করে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আঙ্কল ঝিয়েন কি তাঁদের কাছে ওয়ালহ্যাঙ্গিংটার গল্প করেছিলেন?"

"কী জানি, বলতে পারব না।"

"তাঁদের নাম-ধাম কিছু আপনার কাছে আছে?"

"বোধহয় আছে। ঝিয়েনের ডায়েরিতে। দাঁড়াও দেখছি।"

লিয়াংয়ের বাবা উঠে পড়লেন। ভিতরে যেতে গিয়েও ঘুরে তাকিয়ে মেইলিকে কী যেন নির্দেশ দিলেন চিনা ভাষায়। সঙ্গে সঙ্গে মেইলিও দৌড়ে অন্দরে চলে গেল। ফিরেছে ট্রে সাজিয়ে। ট্রে-তে পেস্ট্রি, কাজু আর দু'গ্লাস কোল্ড ড্রিঙ্ক।

টুপুর বলল, "কী কাণ্ড! এসবের আবার কী দরকার ছিল?"

ছোট্ট করে হাসল মেইলি। উত্তর দিল না।

কুশল তড়িঘড়ি গ্লাস তুলে নিয়েছে। চুমুক দিয়ে লিয়াংকে বলল, "আয়, তোরাও একটু শেয়ার কর।"

"আমরা নেব না রে। স্কুল থেকে এসে থুপ্‌কা খেয়েছি।"

টুপুর একটা কাজুবাদাম তুলে দাঁতে কাটল। মেইলিকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি চুলে নীল উল লাগিয়েছ কেন? ফ্যাশন?"

পলকে মেইলির মিষ্টি মুখে বিষাদের ছায়া। ঠোঁট কামড়াচ্ছে।

লিয়াং বোনকে একবার দেখে নিয়ে বলল, "ওটা আমাদের কাস্টম, তুপুর। ঘনিষ্ঠ কোনও রিলেটিভ মারা গেলে মেয়েরা মাথায় নীল উল বাঁধে। আর ছেলেরা হাতে কালো টেপ। মৃত্যুর ঊনপঞ্চাশ দিন পরে আমরা এই উল আর টেপ খুলে পুড়িয়ে ফেলি।"

"ও।" একটু সময় নিয়ে টুপুর ফের বলল, "মেইলিকে কি আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?"

মেইলি অল্প ঘাড় নাড়ল।

"আঙ্কল ঝিয়েন তো তোমায় খুব ভালবাসতেন। তিনি কি তোমাকে ওয়ালহ্যাঙ্গিংটার ব্যাপারে কিছু বলেছিলেন?"

মেইলি ভার মুখে বলল, "না। শুধু একবার বলেছিলেন, ইতিহাসের পাতায় আবার ফু শাংয়ের নাম ফিরে আসবে।"

"তিনি কে?"

"একজন অভিযাত্রী। তিনি নাকি প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ...

নাকি তারও অনেক আগে, জাহাজে চড়ে সমুদ্রে-সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতেন।"

লিয়াং চোখ বড় বড় করে বলল, "কই, বো আমাকে তো বলেনি! ... ওই ওয়ালহ্যাঙ্গিং কি তবে ফু শাংয়েরই ছিল?"

মেইলি বলল, "তা তো আমি জানি না।"

লিয়াংয়ের বাবা ফিরেছেন ঘরে। এক হাতে বাঁধানো ডায়েরি, অন্য হাতে একটা খবরের কাগজ। প্রথমে খবরের কাগজখানাই টুপুরকে বাড়িয়ে দিলেন, "লুক, আমাদের এখানকার লোকাল নিউজ়পেপারে ঝিয়েনের মৃত্যুর খবরটা ডিটেলে বেরিয়েছিল। সঙ্গে ঝিয়েনের ছবিও।"

খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে টুপুর হতবাক। অস্ফুটে বলল, "চাইনিজ নিউজ়পেপার? লোকাল?"

"হ্যাঁ। কলকাতা থেকেই বেরোয়। একটা নয়, দুটো পেপার পাবলিশ হয় চাইনিজ় ল্যাঙ্গোয়েজে। অন্যটাতেও ঝিয়েনের অবিচুয়ারি ছিল, কিন্তু ছবি নেই বলে আনলাম না।"

টুপুর আর কুশল একসঙ্গে ঝুঁকে দেখল ঝাও ঝিয়েনের ছবিটা। দেখে লিয়াংয়ের বাবা বলেও ভুল হতে পারে। একই রকম গোলগাল মুখ, চওড়া কপাল, ফোলা ফোলা চোখের পাতা। শুধু ভাইয়ের চোখে চশমা আছে, দাদার নেই।

কাগজটাকে একটু উলটেপালটে দেখে রেখে দিল টুপুর। লিয়াংয়ের বাবা ফের বসেছেন সোফায়। গর্বিত গলায় বললেন, "আমাদের কমিউনিটিতে ঝিয়েনের খুব কদর ছিল। ওর এই সাডেন চলে যাওয়ায় কলকাতার গোটা চাইনিজ় সমাজ বড় দুঃখ পেয়েছে। ওকে সমাধি দেওয়ার দিন... আই মিন লাস্ট থার্সডে... কত মানুষ যে এসেছিল! ঝিয়েনের স্কুলও ছুটি ডিক্লেয়ার করেছিল সেদিন।"

লিয়াং বলল, "বো-এর ন্যাশনাল লাইব্রেরির বন্ধুরাও এসেছিলেন।"

"দু'জন।" লিয়াংয়ের বাবা ডায়েরি খুললেন, "এই যে, তাঁদের নাম-ঠিকানা চাইছিলে... লেখা আছে এখানে। চাইনিজে লেখা, তোমরা পড়তে পারবে না, নোট করে নাও। নাম্বার ওয়ান, ডক্টর বাসব সমাদ্দার। ফাইভ বাই টু, আর এন দাস রোড, কলকাতা একত্রিশ। নাম্বার টু, ডক্টর শিবতোষ রায়। টোয়েন্টি ওয়ান বাই থ্রি, সিমলাই পাড়া লেন, কলকাতা টু। ...আর-একজনের নামও দেখতে পাচ্ছি। তিনি অবশ্য আসেননি। ডক্টর তরুণ বাসু। এঁর ঠিকানা নেই, ফোন নম্বর আছে..."

তিনটে নাম-ঠিকানাই পরিষ্কার করে টুকে নিল টুপুর। ঝাও ঝিয়েনের স্কুল, আর স্কুলের সহকর্মীদের সম্পর্কেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিল। পাড়া-প্রতিবেশীদের সম্পর্কেও। লিখে নিল লিয়াংয়ের বাবা-মা'র নামও।

আরও কিছুক্ষণ কথা হল টুকটাক। তথ্যভাণ্ডার মোটামুটি সমৃদ্ধ করে উঠে পড়ল টুপুর। লিয়াংয়ের বাবাও বেরোনোর জন্য তৈরি।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে লিয়াংয়ের বাবা বললেন, "কী মনে হল? এইসব ইনফরমেশন থেকে কিছু বেরোবে?"

"দেখি। মাসির সঙ্গে আলোচনা করি। প্রয়োজন হলে মাসিকে নিয়ে আবার আসব।"

"ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম। ঝিয়েনের মৃত্যুরহস্য জানার জন্য আমিও বড় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।"

বাড়ির সদরে এসে টুপুর দাঁড়াল ক্ষণেক। মেইলিও এসেছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে। মুখ থমথম, দু'চোখ ভরে গিয়েছে জলে।

মেয়েটার কাঁধে আলগা চাপ দিল টুপুর, "মন খারাপ কোরো না

মেইলি। তোমার বো'কে যদি সত্যিই কেউ মেরে থাকে, তাকে আমরা ধরবই। কথা দিলাম।"

মেইলির চোখের জল এবার টুপটুপ নেমে এসেছে গালে। ফুঁপিয়ে উঠল মেয়েটা।

বাড়ি ফিরেই পড়ার বই নিয়ে বসে গিয়েছিল টুপুর। বসাই সার, মন দিতে পারছে না। ঘুরেফিরে ঝাও ঝিয়েনই চলে আসছেন চিন্তায়। লিয়াংয়ের বাবা, লিয়াং, মেইলি, এমনকী কিউরিও শপের বদমেজাজি মালিকটার কথা শুনে ধরে নেওয়াই যায়, ঝিয়েন মানুষটি ছিলেন নিতান্তই নিরীহ। একটা ওয়ালহ্যাঙ্গিং কেনার দরুন তাঁকে কিনা দুনিয়া থেকেই সরে যেতে হল? কী এমন বিশেষত্ব থাকতে পারে একফালি কাপড়ের টুকরোয়, যাতে কিনা ইতিহাস বদলে যাবে? মেইলি আবার কোত্থেকে যেন ফু শাং নামের এক আধাপৌরাণিক ক্যারেক্টারকেও এনে ফেলল!

না, গুলিয়ে যাচ্ছে। এমন নয় তো, স্রেফ এক মোটর দুর্ঘটনাকে অকারণে রহস্যময় করে তোলা হচ্ছে? হয়তো সেদিন এমনিই প্রিন্সেপ ঘাটে বেড়াতে গিয়েছিলেন মিস্টার ঝিয়েন! পছন্দের জিনিসখানা হাতে পেয়ে হয়তো বেজায় আনন্দ হয়েছিল, হঠাৎই সাধ জেগেছিল গঙ্গার হাওয়া খাওয়ার। মানুষের মনে কখন কী ইচ্ছের উদয় হয়, কেউ কি তা নিখুঁতভাবে বলতে পারে? ...কিন্তু ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা যে মিসিং হয়েছে, এতে তো কোনও সন্দেহ নেই। কে নিল? কেন নিল? অবশ্য এ-ও হতে পারে, যে ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা

নিয়েছে, সে হাতের সামনে পেয়েছে বলেই নিয়েছে। মোবাইলটাও হয়তো সেভাবেই গিয়েছে। ডেডবডির কব্জি থেকে ঘড়ি খোলা, কিংবা পকেট থেকে পার্স সরানোর মতো ঝুঁকিতে সে যায়নি। পুরনো হিজিবিজি ন্যাকড়া ভেবে ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা সে হয়তো এতদিনে ফেলেও দিয়েছে। হতে পারে। হতেও তো পারে।

ভাবনার মাঝেই ডোরবেলের ঝংকার। এবং মেঘ না-চাইতেই জল, মিতিনমাসি স্বয়ং হাজির। হাতে ইয়া এক বাক্স। চিকেন মোমোয় ঠাসা।

সহেলি মহা আহ্লাদিত। দু'গাল ছড়িয়ে বললেন, "হঠাৎ এত খাবার কেন রে?"

"পেমেন্ট পেয়েছি," মিতিন মিটিমিটি হাসছে, "জাল উইলের রহস্যজাল ফর্দাফাঁই। বাড়ির ছোট ছেলের শ্রীঘর বাসের বন্দোবস্ত করে এলাম।"

অবনী দোকানের খাবার দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, তবে মোমোর প্রতি তাঁর কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে। সহেলিকে বললেন, "চটপট দুটো বের করো তো। গরম গরম টেস্ট করে দেখি।"

বড় প্লেটে মোমোর পাহাড় সাজিয়ে দিলেন সহেলি। টপাটপ উড়ে যাচ্ছে। মিতিন একটা মোমোতে লঙ্কা-রসুনের চাটনি মাখাতে মাখাতে টুপুরকে প্রশ্ন করল, "তারপর মিস ওয়াটসন, তোমার তদন্তের কী হাল?"

টুপুর বিরস মুখে বলল, "ধুৎ, খুন করার কোনও জোরদার কারণই খুঁজে পাচ্ছি না।"

"তার মানে তোর মনে হচ্ছে খুন নয়?"

"বলতে পারো। তবে লিয়াংরা মানতে চাইছে না।"

"পোস্টমর্টেম রিপোর্ট কী বলছে? হোমিসাইড?"

"ওরা বোধহয় পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এখনও পায়নি। নইলে তো

লিয়াং আমায় বলত।" টুপুর চোখ কুঁচকোল, "আচ্ছা মিতিনমাসি, মিস্টার ঝিয়েন যদি গাড়িচাপা পড়েই মারা গিয়ে থাকেন, পোস্টমর্টেম কী করে ধরবে এটা খুন?"

"যদি সত্যিই ভদ্রলোক রানওভার হয়ে থাকেন, তা হলে খুন কিনা বোঝা কঠিন। কিন্তু ভদ্রলোক যে গাড়িচাপাই পড়েছেন, এটা কি এখনও প্রমাণ হয়েছে? কোনও প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া গিয়েছে কি?"

"না। তখন তো ওদিকে নির্জন রাস্তা..."

"নির্জন রাস্তায় তো ডেডবডিও ফেলে দেওয়া যায়। তারপর তার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিলে প্রাথমিকভাবে রানওভারের কেসই মনে হবে।"

"তা বটে। কিন্তু কেন..."

"কেনটেন তো পরে ভাবা যাবে। আগে বল, এটা সম্ভব, কি সম্ভব না?"

"সম্ভব।"

"অতএব পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আগে দরকার। যদি দেখা যায়, গাড়িচাপা পড়াটাই মৃত্যুর কারণ, তখন সেটা কেউ ইচ্ছে করে করেছে, নাকি অনিচ্ছাকৃত, সেটা ভাবা যেতে পারে। তার আগে পর্যন্ত গোটা দৌড়টাই বুনো হাঁসের পেছনে ছোটা।"

অবনী মন দিয়ে মাসি-বোনঝির কথোপকথন শুনছিলেন। হালকা ভাবে মন্তব্য ছুড়লেন, "তার মানে টুপুরের অভিযান বৃথা গেল?"

মিতিন হেসে বলল, "তা কেন অবনীদা? জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। দু'দিনের ঘোরাঘুরিতে কিছু অভিজ্ঞতা তো হল টুপুরের।"

"বটেই তো," টুপুর ঘাড় নাড়ল, "একটা চিনা পরিবারকে তো কাছ থেকে দেখা গেল।"

"কী কী কথা হল সেখানে? যা বলেছিলাম সেভাবে নোটফোট করেছিস?"

"হুঁ।"

আস্তে আস্তে টুপুরের পেট থেকে আজকের অভিযানের যাবতীয় বৃত্তান্ত নিপুণভাবে বের করে নিল মিতিন। খানিকক্ষণ চোখ বুজে ভাবল কী যেন। চোখ পিটপিট করে বলল, "প্রিন্সেপ ঘাটে মৃত্যু... মানে হেস্টিংস থানার কেস?"

"হ্যাঁ। লিয়াংয়ের বাবা তো হেস্টিংস থানাতেই গিয়েছিলেন।"

"ঠিক আছে, আমি তো ফ্রি হয়েছি, এবার আমি দেখছি। পরশু তোর স্কুল ছুটি আছে না?"

" হুঁ। জন্মাষ্টমী।"

"ওদিন তৈরি থাকিস, তোকে নিয়ে বেরোতে পারি। যে নাম-ঠিকানাগুলো টুকে এনেছিস, আমায় একটা কাগজে লিখে দে। তোর লিয়াংয়ের কাকার সম্পর্কে ভাল করে খোঁজখবর করি।"

টুপুর ঘর থেকে কাগজ-কলম নিয়ে এল। দেখে দেখে নামধাম লিখছে, তখনই আবার মিতিনের প্রশ্ন, "আচ্ছা টুপুর, তুই বললি মিস্টার ঝিয়েনকে সমাধি দেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার। অর্থাৎ মৃত্যুর পাঁচ দিন পর। এত দিন দেরি হল কেন? মর্গ থেকে বডি পেতে কি লেট হয়েছিল?"

অবনী বললেন, "চিনারা একটু দেরি করেই সমাধি দেয়, মিতিন।"

"কেন?"

"কারণ, এ-ব্যাপারে ওদের একটা সংস্কার আছে। চিনাদের ধারণা, মানুষের আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে যতক্ষণ না পর্যন্ত হোয়াংহো নদীর জলে নিজের ছায়া দেখে বুঝতে পারছে সে আর বেঁচে নেই, ততক্ষণ তার দেহ সমাধিতে শোওয়ানো উচিত নয়।

মারা যাওয়ার পর ডেডবডি তাই দু'-চার দিন বরফে রেখে দেয় ওরা।"

"তাই নাকি? এটা তো আমার জানা ছিল না!"

"স্বীকার করছ তা হলে, তোমারও অনেক কিছুই অজানা রয়ে গিয়েছে?". অবনী হো-হো হেসে উঠলেন, "আমাদের এই কলকাতায় এখনও কত চিনা বাস করে, সে-খবরটা রাখো তো?"

মিতিন বলল, "হবে হাজার দশেক।"

"উঁহুঁ। প্রায় কুড়ি হাজার।" অবনী হাসিটা ধরে রেখেই বললেন, "আমারও এখানকার চিনাদের সম্পর্কে এত নলেজ ছিল না। টুপুর কেসটায় নাক গলিয়েছে দেখে আমার জ্ঞানপিপাসা বেড়ে গেল। ইন্টারনেট ঘেঁটে ঘেঁটে ইনফরমেশনগুলো জোগাড় করে ফেললাম। কিছু নলেজ টুপুরকেও পাস করে দিয়েছি।"

"গুড।" মিতিনও হেসে ফেলল, "সব তথ্য মগজে ধরে রাখুন। পরে আমাদের কাজে লাগতে পারে।"

সহেলি চা করতে গিয়েছিলেন। কাপে চিনি নাড়তে নাড়তে ফিরলেন আসরে। ডিশগুলো টেবিল থেকে নামাতে নামাতে বললেন, "আর কী, মাসি-বোনঝি আবার ধ্যাতাং-ধ্যাতাং শুরু করে দাও। ...টুপুর, তুমি কিন্তু ভুলে যেও না, পুজোর আগে তোমার পরীক্ষা আছে।"

"জানি তো।" টুপুর মাকে আর এগোতে দিল না। মিতিনকে বলল, "কুশলকেও কিন্তু আমরা সঙ্গে রাখব। ও এই কেসটায় খুব ইন্টারেস্ট পেয়েছে।"

"ছেলেটা কেমন? বুদ্ধিসুদ্ধি আছে?"

"একটু হামবাগ। পেটুক। তবে বোকা নয়।"

"থাকুক তা হলে। এবার তো আর তোর পার্থমেসো জয়েন করতে পারছে না। প্রেসে ডিটিপি বসিয়েছে, নিজে নিজেই কম্পোজ়

করছে। পুজো পর্যন্ত তার নড়াচড়ার উপায় নেই। কুশল নয় তোর পার্থমেসোর প্রক্সি দিক।"

অবনী বললেন, "তা হ্যাঁ হে, পুজোয় বেরোনোটা হচ্ছে তো? পার্থ তো একবার আওয়াজ তুলেই চেপে গেল, আর কোনও সাড়াশব্দ নেই!"

সহেলি ঝামরে উঠলেন, "শুনছ না, বেচারা এখন ব্যস্ত?"

"আহা, ট্রেনের টিকিট কাটতে হবে না? অগাস্ট তো প্রায় শেষ হয়ে এল!"

মিতিন ফিক করে হাসল। টুপুরকে বলল, "অ্যাই, তোর বাবাকে বলে দে গোয়েন্দাগিরির প্রথম শিক্ষাটা কী?"

টুপুর মাথা চুলকোল, "কী গো?"

কোনও কিছু আগে থেকে ধরে নিতে নেই।... অবনীদা, আপনি কেন ভাবছেন আমরা ট্রেনেই মুম্বই যাব? প্লেনেও তো যেতে পারি।"

সহেলির মুখ হাঁ হয়ে গেল, "এরোপ্লেন? আকাশপথে মুম্বই?... কিন্তু যদি অ্যাকসিডেন্ট-ফ্যাকসিডেন্ট হয়?"

"দুর্ঘটনা কীসে হয় না, দিদি? ওভাবে ভাবলে ট্রেন-বাস-ট্রাম-ট্যাক্সি, কোনও কিছুতেই তো চড়া যায় না। এমনকী, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকলেও তো গাড়ি এসে ধাক্কা মারতে পারে। তার জন্য কি পথে বেরোনো বন্ধ করে দেবে?"

"ঠিকই তো। বটেই তো।" প্লেনে চড়ার প্রস্তাবে টুপুর টগবগ ফুটছে। উত্তেজিতভাবে বলল, "মিস্টার ঝিয়েনের কী হল, অ্যাঁ? তিনি তো বেজায় সাবধানি ছিলেন। তাঁকেও তো গাড়িচাপা পড়েই..."

"নো টুপুর। নো।" মিতিন আঙুল দোলাচ্ছে, "ওই ব্যাপারটায় তুমি কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারো না। মিস্টার ঝিয়েনের মৃত্যুর কারণ এখনও তদন্তের পর্যায়ে।"

টুপুর অপ্রস্তুত মুখে হাসল, "তা ঠিক।"

রাতে একটা বিদ্‌ঘুটে স্বপ্ন দেখল টুপুর। শাঁ-শাঁ করে একটা গাড়ি ছুটছে। লিয়াংয়ের বাবা দৌড়ে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন, গাড়িটা তাঁকে পিষে দিয়ে শূন্যে উড়ে গেল। পলকে এরোপ্লেন হয়ে গিয়েছে গাড়িটা, পাইলটের সিটে বসে আছে কিউরিও শপের মালিক। এরোপ্লেনের লেজের দিকটায় ঝুলছে একটা হলুদ রঙের ময়লা কাপড়। কুশল, টুপুর আর লিয়াং তাড়া করছে প্লেনটাকে। বাতাসে ভেসে ভেসে। অনেকটা কুইডিচ খেলার মতো। হঠাৎই বুদুম আওয়াজ, প্লেনটা দাউদাউ জ্বলে উঠল। সহেলি বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছেন...।

ঘুম ভাঙার পরও ধন্দ-মাখা মুখে বিছানায় বসে রইল টুপুর। বিটকেল স্বপ্নটার কোনও অর্থ আছে কি? কী হতে পারে? ভবিষ্যতের কোনও আভাস?

কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল জোর। প্রায় ঘণ্টাখানেক। বর্ষা যেন এ-বছর গিয়েও যাচ্ছে না। মাঝে মাঝেই জানান দিচ্ছে নিজেকে। সকালবেলা অবশ্য মেঘ কেটে গিয়ে ঝিকমিক করছে রোদ্দুর। বেলা বাড়তে না-বাড়তে সূর্যের তাপ রীতিমতো চড়া। একটা বিচ্ছিরি চিটচিটে গরমে প্রাণ আইঢাই।

পৌনে এগারোটা নাগাদ বেকবাগানের মোড়ে এসে থামল মিতিনের গাড়ি। নিজের নয়, ভাড়ার। সারাদিনের জন্য আজ গাড়িটা নিয়েছে মিতিন, এতে নাকি ঘোরাঘুরির সুবিধে হয়।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে টুপুর বলল, "ইস, প্রথমেই আজ ওই লোকটার মুখ দেখতে হবে।"

কুশল বলল, "আমাকে দেখলে আবার চটে যাবে নির্ঘাত। সেদিন এমন ক্রস করা শুরু করেছিলাম..."

মিতিন বলল, "আজ কিন্তু তোমরা চুপ থাকবে। যা প্রশ্ন করার আমিই করব। অ্যান্ড ওয়ান মোর থিং, আমার কোনও প্রশ্নেই অবাক হবে না।"

কিউরিও শপ খুলেছে সবেমাত্র। দোকান-মালিক আজ একা নন, একজন কর্মচারীও রয়েছে। ডাস্টার বুলিয়ে ঝাড়পোঁছ করছে কাচের শো-কেস। আর মালিক ছোট্ট একটা গণেশের মূর্তির সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে।

ঢুকেই মিতিন গলাখাঁকারি দিল, "এই যে মিস্টার...এই যে মিস্টার? শুনছেন?"

ঘুরে মিতিনকে দেখে ঠোঁটে একটা হাসি ফুটব-ফুটব করছিল, কিন্তু পাশে দুই ল্যাংবোটকে দেখে ভদ্রলোকের মুখটা কেমন ভেটকে গেল। কপালে একরাশ ভাঁজ ফুটিয়ে বললেন, "ইয়েস?"

"আমি থার্ড আই থেকে আসছি।" ভ্যানিটিব্যাগ খুলে ভিজ়িটিং কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিল মিতিন, "আমি একজন লাইসেন্সড প্রাইভেট ডিকেটকটিভ।"

কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে কাউন্টারের কাচের তলায় রেখে দিলেন ভদ্রলোক। কপালের ভাঁজ সামান্য হাল্‌কা করে বললেন, "আমার কিন্তু নতুন করে কিছু বলার নেই।"

"কিন্তু আমাদের কৌতূহল যে মেটেনি মিস্টার..."

"আমি স্বপন দত্ত। আপনি মিস্টার দত্ত বলতে পারেন। অথবা স্বপনবাবু।"

"স্বপনবাবুই ভাল।" মিতিন আলগা হাসল, "আমি আপনার বেশি সময় নেব না। জাস্ট দু'-চারটে প্রশ্ন..."

"বলুন? চটপট।"

"মিস্টার ঝিয়েন... মানে যে চিনা ভদ্রলোকটির অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে..."

"অস্বাভাবিক বলছেন কেন?" স্বপনবাবুর গলায় ঠাট্টার সুর, "কলকাতার রাস্তায় গাড়িচাপা পড়া তো অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা।"

"মিস্টার ঝিয়েন গাড়িচাপা পড়ে মারা যাননি, স্বপনবাবু।"

"যাঃ। কী বলছেন?... তা হলে কী করে মারা গিয়েছেন?"

"সেটা আপাতত না-জানলেও চলবে। তা ছাড়া বলার হয়তো প্রয়োজনও নেই। মৃত্যুর কারণটা হয়তো আপনার জানাই আছে।"

"আমি... কী করে জানব?"

"সে তো সময়ই বলে দেবে।"

স্বপনবাবু বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছেন। কুশল আর টুপুরও মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। একটা বিস্ময় ঠেলে উঠতে চাইছিল টুপুরের গলায়, কোনওক্রমে সেটাকে গিলে নিল টুপুর।

মিতিন টুল টেনে বসেছে। দোকানটায় চোখ বোলাতে বোলাতে বলল, "হ্যাঁ, যে-কথা হচ্ছিল...। মিস্টার ঝিয়েন আপনার এখান থেকে যে-বস্তুটি কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন, আর কেউ কি সেটা কখনও কিনতে এসেছিল? অন্য কোনও কাস্টমার?"

"আমি তো দোকানে ওটা আগে টাঙাইনি। সুতরাং আর কারও..."

"ভাল করে ভেবে বলুন। উত্তরটা কিন্তু খুব ভাইটাল।"

একটু ভাবার চেষ্টা করে স্বপনবাবু বললেন, "মনে পড়ছে না।... মন্টু, ওই ঝঞ্ঝাটে ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা কিনতে আর কেউ এসেছিল নাকি রে?"

কর্মচারীটি গোল গোল চোখে তাকিয়ে ছিল। আমতা আমতা করে বলল, "একজন বোধহয় এসেছিল। আপনি বেচবেন না বলেছিলেন বলে তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছিলাম।"

"কবে এসেছিল? কখন?" এবার স্বপনবাবুর গলায় বিস্ময়, "আমাকে বলিসনি তো?"

"আপনি সেদিন সন্ধেবেলায় তাড়াতাড়ি চলে গেলেন... পরদিন আমার আর মনে ছিল না।"

"দেখেছেন তো কাণ্ড! আমাকে কেমন অড পজ়িশানে ফ্যালে!" স্বপনবাবু গজগজ করছেন। বিরক্ত গলায় মন্টুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কবে এসেছিল বল তো? ওই ঝিয়েনবাবু দোকানে ঘুরে যাওয়ার আগে, না পরে?"

"পরে।" মন্টু ঘাড় চুলকোল, "হ্যাঁ, পরেই হবে।"

এবার মিতিনের প্রশ্ন করার পালা, "তিনিও কি চাইনিজ়?"

"না না, বাঙালি।"

"চেহারা মনে আছে?"

"খেয়াল নেই। রোজ এত কাস্টমার আসে...। তবে প্যান্টশার্ট পরা ছিল।"

"ফরসা? কালো? চোখে চশমা? টাক মাথা?"

"একদমই মনে নেই ম্যাডাম।"

"দেখলেও মনে পড়বে না?"

"হয়তো...। কী যে বলি...!"

"অলরাইট। আপনি কাজ করুন।" মিতিন আবার স্বাপনবাবুতে ফিরল। হেসে বলল, "প্রথম প্রশ্নটা তো গুবলেট হয়ে গেল। যাক গে, এবার নেক্সট। ...মিস্টার ঝিয়েন যেদিন আপনার দোকান থেকে জিনিসটা কিনলেন, সেদিনটার কথা আপনার স্মরণে আছে তো?"

"মোটামুটি। উনি অ্যারাউন্ড পৌনে তিনটেয় এসেছিলেন।

ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা প্যাক করে দিলাম, দু'-তিন মিনিটের মধ্যেই উনি দোকান থেকে বেরিয়েও গেলেন।"

"বাঃ, আপনার মেমারি তো বেশ শার্প।... এবার বলুন তো, মিস্টার ঝিয়েন বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে শুরু করে সন্ধে সাতটা অবধি আপনি কোথায় ছিলেন?"

"দোকানেই ছিলাম। আর কোথায় যাব!"

"ভাল করে ভেবে বলুন। আমি কিন্তু আপনার স্টেটমেন্ট ভেরিফাই করব।"

এতক্ষণে স্বপনবাবুকে একটু থতমত দেখাল। একটুক্ষণ নাক কুঁচকে থেকে বললেন, "ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেদিন মন্টু আসেনি তো... আমার একটা জরুরি কাজ ছিল, তাই দোকান বন্ধ করে বেরোতে হয়েছিল।"

"কী কাজ জানতে পারি?"

"আপনাকে বলব কেন? আমার পারসোনাল কাজ থাকতে পারে না?"

"অবশ্যই পারে। তবে মিস্টার ঝিয়েনের মৃত্যুটা তো আপনার দোকান থেকে বেরোনোর পর হয়েছে...। আমাকে না-বলতে চাইলে ক্ষতি নেই, তবে পুলিশ কিন্তু বের করে নেবে।"

স্বপনবাবুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, "আবার পুলিশ আসবে নাকি? কেন?"

"বা রে, ডেথটা যদি সিম্পল রানওভার না হয়, পুলিশ সব্বাইকে একটু বাজিয়ে বাজিয়ে দেখবে না?"

"সক্কাল সক্কাল এ কী শুরু করলেন বলুন তো?" স্বপনবাবুকে এবার রীতিমতো বিপর্যস্ত দেখাল। একটুক্ষণ থম মেরে থেকে গোমড়া মুখে বললেন, "ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম।"

"কোন ব্যাঙ্ক?"

"সেটাও জানাতে হবে? স্টেট ব্যাঙ্ক। থিয়েটার রোড ব্রাঞ্চ।"

লোকটা ডাহা মিথ্যে কথা বলছে। টুপুরের জিভ নিশপিশ করছিল। ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "কিন্তু সেদিনটা তো ছিল শনিবার। স্যাটারডেতে তিনটের পরে ব্যাঙ্কে তো কাজ হয় না!"

মিতিন বলল, "দেখেছেন তো, স্কুলের ছেলেমেয়েরাও জানে। এত সিলি মিথ্যে বলার কোনও মানে হয়?"

স্বপনবাবু এবার পুরোপুরি কাহিল। মিনমিন করছেন, "বিশ্বাস করুন, মিস্টার ঝিয়েনবাবুর মৃত্যুর ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।"

"আপনি কোথায় গিয়েছিলেন, সম্ভবত সেটা আমি জানি। এবং সে জায়গাটা বোধহয় প্রিন্সেপ ঘাট থেকে খুব দূরেও নয়। কী বলেন?"

ভীষণ চমকেছেন স্বপনবাবু। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, "আ-আ আপনি আ-আমাকেই খুনি ঠাওরালেন নাকি?"

"বললাম তো, টাইম উইল টেল।" মিতিনের মুখ ভাবলেশহীন। নীরসভাবে বলল, "আশা করি, এর পরের প্রশ্নের উত্তরটা আমাকে ঠিকঠাক দেবেন।"

"আপনি ভুল করছেন ম্যাডাম, আমি কিন্তু খারাপ লোক নই।"

মিতিন কথাটাকে আমল দিল না। বলল, "আমি ওয়ালহ্যাঙ্গিংটার হিস্ট্রি ডিটেলে জানতে চাই। আপনার কাছে কোত্থেকে এল... কীভাবে এল..."

"আমি তো আগের দিনই ওদের বলেছি।" কুশল আর টুপুরকে দেখালেন স্বপনবাবু, "ওটা আমার বাড়িতেই ছিল।"

"হঠাৎ তা হলে দোকানে নিয়ে এলেন কেন? তা-ও মাত্র এক-দু' মাস আগে?"

"সত্যি বলব? বিশ্বাস করবেন তো?"

"শুনি।"

"ওই জিনিসটা আগে আমি দেখিইনি। কিছুদিন আগে পুরনো বাক্সপ্যাঁটরা ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎই চোখে পড়েছিল।"

"পরিষ্কার হল না। আপনার বাড়িতে ছিল, অথচ আগে দেখেননি...!"

"তা হলে আর-একটু খুলে বলি। আমরা এখন থাকি ভবানীপুরে। যদুবাবুর বাজারের কাছে। তবে আমাদের আদি বাড়ি বজবজে। ওখানে আমাদের পৈতৃক বাড়িটা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, তাই বছর দশেক আগে বিক্রি করে দেওয়া হয়। ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, আমার এই দোকানের মূলধনের মেজর পোরশন এসেছিল ওই টাকার ভাগ থেকে। ও-বাড়ির বড় বড় ফার্নিচারগুলো নিলামঘরে দিয়ে দেওয়া হয়, আর কিছু দরকারি-অদরকারি মাল আমরা জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভাইবোনরা ভাগাভাগি করে নিই। তখনই বোধহয় ওটা কোনও ট্রাঙ্কে করে এসে গিয়েছিল আমাদের কাছেতে। যে-পুরনো ট্রাঙ্কে ওটা পাওয়া যায়, সেই ট্রাঙ্কটা রাখা ছিল আমাদের ভবানীপুরের বাড়ির চিলেকোঠায়। সম্প্রতি ঘরটা সাফ করাচ্ছিলাম, তখনই...। জিনিসটা দেখে ভারী চোখে লেগে গেল, দোকান ডেকরেট করার জন্য এনে টাঙিয়ে দিলাম।"

"কিন্তু বিক্রি করতে চাইছিলেন না কেন?"

"তার অবশ্য একটা কারণ আছে। আমার বাবা... একাশি বছর বয়স... আমার সঙ্গেই থাকেন... ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা সেল করতে আমাকে নিষেধ করেছিলেন। ফর সেন্টিমেন্টাল রিজ়নস।"

"কীরকম?"

"আমাদের এক পূর্বপুরুষ... কত পুরুষ আগে বাবাও জানেন না, তবে অনেক... আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার ঠাকুরদা গোছের কেউ একজন নাকি বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। তিনি এক চাইনিজ়কে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান। সেই চিনাটিই নাকি আমাদের ওই

ডাক্তার পূর্বপুরুষকে ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা প্রেজেন্ট করেছিল। আমি অবশ্য এত গল্প জানতাম না, বাবাই বললেন। উনি জিনিসটা দেখামাত্র চিনতে পেরেছিলেন। ইনফ্যাক্ট, ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা কার আঁকা বাবা সেই নামটাও বলেছিলেন আমাকে। অ্যান্ড স্ট্রেঞ্জলি, ঝিয়েনবাবুও ওটা দেখে ওই রকমই একটা নাম বলেছিলেন।"

"কী নাম?"

"দাঁড়ান। আমি মনে রাখতে পারি না। সোমবার এই ছেলেমেয়েগুলো ঘুরে যাওয়ার পর আবার কোনও বখেড়া হতে পারে ভেবে বাবার কাছ থেকে ফের জেনে নিয়েছি।" স্বপনবাবু পকেট থেকে পার্স বের করলেন। হাতড়ে হাতড়ে একখানা চিরকুট। চোখে চশমা লাগিয়ে পড়লেন, "মো-ই-টং।"

মিতিন লিখে নিল নামটা। হেসে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

স্বপনবাবুর চোখমুখ সামান্য উজ্জ্বল হয়েছে। বললেন, "দেখছেন তো ম্যাডাম, কোনও কিছুই গোপন করা আমার উদ্দেশ্য নয়!"

"এখনও পর্যন্ত যা বললেন, তাতে কিন্তু প্রমাণ হয় না আপনি নির্দোষ। ...যাক গে, একটা ইনফরমেশন কিন্তু এখনও পাইনি। বাবা বারণ করা সত্ত্বেও আপনি জিনিসটা বেচলেন যে বড়?"

"উনি বারবার এসে চাইছিলেন..."

"শুধু সেই কারণেই?"

এবার আর জবাব নেই। মিতিনকে একবার আড়চোখে দেখে মাথা নামিয়ে নিয়েছেন স্বপন দত্ত। অস্ফুটে বললেন, "ভাবলাম ফালতু ফালতু টাকাটা এসে যাচ্ছে... শনিবার টাকাটার খুব দরকারও ছিল..."

মিতিন বাঁকা হেসে বলল, "লাভ হয়েছিল টাকাটা পেয়ে?"

এবারও উত্তর নেই। স্বপনবাবুর মাথা আর উঠছেই না।

মিতিন মৃদু গলায় বলল, "ও-কে। আজ তা হলে চলি। প্রয়োজন হলে আবার আসব কিন্তু!"

রাস্তায় এসে কুশল বলল, "দেখেছিস তো টুপুর, আমি সেদিনই বলেছিলাম, লোকটা সুবিধের নয়!"

টুপুর বলল, "হুম্। তাই তো মনে হচ্ছে। নইলে মিতিনমাসি এতক্ষণ ধরে জেরা করে!"

ভাড়াগাড়িটা বেশ খানিকটা দূরে পার্ক করা আছে। সেদিকে এগোতে এগোতে মিতিন বলল, "আমি তো ক্রস করলাম খুনের মোটিভ জানতে। সিধে আঙুলে ঘি উঠবে না বলে একটু ভয় দেখাতে হল।"

টুপুর বলল, "কিন্তু আঙ্কল ঝিয়েন খুনই হয়েছেন তুমি বুঝলে কী করে?"

"ওরে গাধা, আদৌ কোনও খবর না-নিয়ে আমি এগোই নাকি? হেস্টিংস থানা, লালবাজার, দু'জায়গাতেই আমার যোগাযোগ করা হয়ে গিয়েছে। আর আমার সংশয়টাই সত্যি। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে, মৃত্যুর কারণ কার অ্যাক্সিডেন্ট নয়, হেড ইনজুরি। অর্থাৎ মাথায় আঘাত করে মিস্টার ঝিয়েনকে আগে মারা হয়েছিল, তারপর বডিটা ওখানে ফেলে দিয়ে তার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেওয়া হয়।"

"কী সর্বনাশ! লিয়াংরা খবরটা পেয়েছে?"

"পেয়ে যাবে। কিংবা হয়তো পেয়ে গিয়েছেও।"

কুশল উত্তেজিতভাবে বলল, "কে করল খুন? ওই স্বপন দত্ত নিশ্চয়ই?"

"আশঙ্কা কম। লোকটার খুন করার মতো সাহস আছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া মোটিভটাও তেমন জোরালো নয়। ওয়ালহ্যাঙ্গিংটার মূল্য সম্পর্কে ধারণা থাকলে স্বপন দত্ত থোড়াই ওটাকে বেচত।... লোকটা লোভী... নেশাড়ু... তবে খুন..."

কুশল বলল, "কিন্তু মাসি, তুমিই তো বললে ও সেদিন প্রিন্সেপ ঘাটের কাছাকাছি ছিল।"

মিতিনের ঠোঁটে রহস্যের ঝিলিক, "তা ছিল। তবে গঙ্গার ধারে নয়। রেসের মাঠে। দশ হাজার টাকা পেয়ে, দোকান বন্ধ করে, রেস খেলতে চলে গিয়েছিল।"

টুপুর বিস্মিত গলায় বলল, "এত খবর তুমি জানলে কী করে?"

"ওহে মিস ওয়াটসন, কত বার বলেছি না, গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে চোখকান খোলা রাখতে হয়! স্বপন দত্তর কাউন্টারের কাচের নীচে রেসের বই পড়ে ছিল দেখেছিস? শৌখিন রেসুড়েরা বই কেনে না। যারা নিয়মিত যায়, তাদের কাছেই ওই বই থাকে। রেসুড়ে লোক শনিবার করকরে দশ হাজার টাকা পেলে দোকানটোকান শিকেয় তুলে আর কোথায়ই বা যেতে পারে! একে-একে দুই করে ওটা মিলিয়ে দিয়েছি। আর তাতে কেমন কাজও হল বল? হুড়মুড় করে পেটের কথা সব বেরিয়ে এল। আমি তো তা-ও অল্পেই ছাড়ান দিলাম, এর পর পুলিশ ওকে যা ভোগাবে! তুলে নিয়ে গারদে না পুরে দেয়।"

মিতিনের সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে বসেছে টুপুর আর কুশল।

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "এবার কোথায়? বাড়ি?"

সামনের সিটে বসে মুচকি হাসল মিতিন, "ধুৎ, সবে তো কলির সন্ধে। এখন আমরা যাব ঢাকুরিয়ায়।"

"তোমার বাড়ি?"

"না। বাসব সমাদ্দারের বাড়ি। আমাদের দাসপাড়ায়।"

"কাকে চাই?"

"মিস্টার বাসব সমাদ্দার... আই মিন, ডক্টর সমাদ্দার..."

"এখন দেখা হবে না। উনি কাজে বসেছেন।"

"একটা জরুরি দরকার ছিল যে।"

"কাল আসবেন। সকাল ন'টায়। পড়াশোনায় বসে গেলে উনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না।"

কাজের মেয়েটি মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিল, তার আগেই মিতিন চৌকাঠে পা গলিয়ে দিয়েছে।

মেয়েটি রুক্ষ স্বরে বলল, "আপনারা জোর করে ঢুকবেন নাকি?"

"ধরো তাই," মিতিনের স্বরও কড়া, "গিয়ে বলো, আমরা থানা থেকে আসছি।"

কথাটা যেন বিশ্বাস হল না মেয়েটির। তিন আগন্তুককে আপাদমস্তক জরিপ করে বলল, "ভেতরে ঢুকবেন না। এখানেই দাঁড়ান। আমি জিজ্ঞেস করে আসি।"

উঁকি দিয়ে বাইরের ঘরখানা দেখে নিল টুপুর। ভারী অগোছালো। কালচিটে হয়ে যাওয়া বেতের সোফা যেমন-তেমন ছড়িয়ে আছে, মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে বই, তক্তপোশের উপরও বইয়ের স্তূপ, জানলায় পাতলা পাতলা মলিন পরদা, দেওয়ালের কোনায় কোনায় ঝুল। কোনও অধ্যাপকের ঘর এমন ছ্যাতাপ্যাতা হয়?

কাজের মেয়েটি ফিরেছে। পিছনে কুচকুচে কালো গাঁট্টাগোট্টা

এক মানুষ। মাথার চুল ধবধবে সাদা। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা।

দূর থেকেই হাঁক ছাড়লেন, "তোমরা পুলিশের লোক? ভাঁওতা দেওয়ার জায়গা পাওনি?"

মিতিন মিষ্টি করে হাসল, "আমরা হাফ পুলিশ স্যার। আমি একজন ডিটেকটিভ।"

"অ। তা আমার কাছে কী মনে করে?"

"মিস্টার ঝাও ঝিয়েনের ব্যাপারে একটু কথা বলতে এসেছিলাম।"

"তার ব্যাপারে আবার কী কথা? সে তো মরে ভূত হয়ে গিয়েছে।"

কী কর্কশ লোক রে বাবা! এরকমভাবে কেউ মৃত মানুষ সম্পর্কে বলে?

মিতিনের অবশ্য হেলদোল নেই। নরম করেই বলল, "মিস্টার ঝিয়েনের মৃত্যুটা তো আন্‌ন্যাচারাল, তাই..."

"জানি। গাড়িচাপা পড়েছে। সবসময় যে লোক ভাবের ঘোরে থাকে, তার এই পরিণতিই হয়।"

"ভাবের ঘোরে মানে? উনি তো যথেষ্ট সাবধানি লোক ছিলেন!"

"তা হবে। আমি তো দেখতাম, সর্বদা আজব আজব থিয়োরিতে বুঁদ হয়ে আছে। অ্যাদ্দিন ধরে হিস্টোরিয়ানরা, অ্যানথ্রোপলজিস্টরা, যা বলেছে সবই নাকি ভুল। দুনিয়ায় সব কিছু নাকি চিনেরাই আগে করেছে। হ্যাঃ, যত্ত সব।"

"আমি মিস্টার ঝিয়েনের সম্পর্কেই আর-একটু ডিটেলে জানতে এসেছিলাম।"

"যা বলার তা তো বলেই দিলাম। আর কিছু জানি না।"

"তবু স্যার... আপনারা তো একসঙ্গে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বসতেন..."

"একসঙ্গে নয়। আমি গেলে ও ফেউয়ের মতো পেছনে লেগে থাকত।"

"আপনার সঙ্গে মিস্টার ঝিয়েনের কদ্দিনের পরিচয়?"

"বছর দু'য়েক। আমেরিকার কোথায় কারা প্রথম কলোনি বানিয়েছিল, তাই নিয়ে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে আমার একটা লেকচার ছিল, সেখানেই ও যেচে এসে আলাপ করে।" বাসব সমাদ্দারের গলা ঘড়ঘড় করে উঠল, "প্রথমে ভেবেছিলাম জ্ঞানপিপাসু। পরে দেখলাম, ট্যাড়া বাঁশ। নিজের মত থেকে এক চুল নড়বে না, এবং অন্যকেও সেটা মানাতে চাইবে।"

"শুনছিলাম উনি নাকি প্রায়ই রাতে আপনাকে ফোন করতেন?"

"বাজে কথা। মাঝে মাঝে করত। আমি ওকে সাফ বলে দিয়েছিলাম, তোমার চিনে অহমিকা তুমি ছাড়ো, নচেৎ আমার কাছে আর ভেড়ার চেষ্টা কোরো না।"

"উনি কি আপনাকে একটা ওয়ালহ্যাঙ্গিংয়ের ব্যাপারে কিছু বলেছিলেন?"

"যত্ত সব গুলগাপ্পি। আমি ওর কথা বিশ্বাসই করিনি।" শুভ্র চুলে আঙুল চালাচ্ছেন বাসব সমাদ্দার। হঠাৎই কটকট করে তাকালেন, "অ্যাই, এবার তোমরা যাও তো। ফালতু বকবক করার সময় আমার নেই।"

"বি পেশেন্ট ডক্টর সমাদ্দার।" মিতিনও ফের গলা রুক্ষ করেছে, "আপনাকে একটা কথা বলে রাখা দরকার। মিস্টার ঝিয়েন কিন্তু অ্যাকসিডেন্টে মারা যাননি, ওঁকে মার্ডার করা হয়েছে। ওঁর চেনাপরিচিত সকলকেই আমরা সন্দেহের তালিকায় রেখেছি। আপনিও কিন্তু তার বাইরে নন।"

কীমাশ্চর্যম্, বাসব সমাদ্দার হঠাৎই শান্ত হয়ে গেলেন। তাঁর পুরু ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। ঠান্ডা গলায় বললেন,

"তা হলে তো আমি আর একটি কথাও বলব না। তোমরা এসো।"

মিতিনও ছাড়ার পাত্রী নয়। ততোধিক শীতল গলায় বলল, "তার মানে আপনি আরও কিছু বলতে পারতেন?"

বাসব সমাদ্দার পিছন ঘুরে ভারী পায়ে ভিতরে চলে গেলেন। যেতে যেতেই বললেন, "রত্না, দরজায় ছিটকিনি তোল। আর কোনও টিকটিকি-গিরগিটি যেন আমায় বিরক্ত করতে না পারে।"

একতলা বাড়িটার বাইরে এসে টুপুর ঝেঁঝে উঠল, "কী অভদ্র লোক রে বাবা! একটু বসতে পর্যন্ত বলল না!"

কুশল আহত গলায় বলল, "লোকের বাড়ি গেলে অন্তত এক গ্লাস জল তো খাওয়ায়!"

মিতিন বলল, "সহবতজ্ঞান নেই। তবে লোকটা ইন্টারেস্টিং। টুকুস টুকুস করে কিছু খবর তো বের করা গেল।"

"সেটাও বললেন কী রেগে রেগে!"

"রাগের অনেকটাই লোক দেখানো। ইচ্ছেমতো স্নায়ু কন্ট্রোল করার ক্ষমতা আছে প্রোফেসর সাহেবের। এই ধরনের মানুষরা সাংঘাতিক ক্লেভার হয়। ইনি মিস্টার ঝিয়েনকে সমাধি দেওয়ার দিন গিয়েছিলেন না?"

কুশল গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বলল, "হ্যাঁ। লিয়াংরা তো তাই বলল।"

"বোঝ তা হলে। একদিকে কথা শুনে মনে হচ্ছে, মিস্টার ঝিয়েনের নাম শুনতে পারেন না, ওদিকে তাঁর ফিউনারালে প্রেজেন্ট!"

টুপুর ফুট কাটল, "ওঁকে কিন্তু আর-একটু টোকা দিয়ে দেখলে পারতে, মিতিনমাসি।"

"হুম্। কিন্তু এখন যে পেটে ইঁদুররা টোকা দিচ্ছে রে। চল, আমার বাড়িতে গিয়ে আগে খাওয়াদাওয়াটা সারি।"

"কী মেনু গো?"

"দিশি মোরগের ঝোল, আর ভাত।"

কুশল সিটে বসেই লাফিয়ে উঠল, "ওয়াও!"

একটু তাড়াতাড়িই সন্ধে নেমেছে আজ। দুপুর পর্যন্ত দিব্যি রোদ ছিল, তারপর আবার মেঘ জমতে শুরু করেছে আকাশে। তড়িঘড়ি গা ঢাকা দিয়েছেন সূর্যদেব। তাপ এখন অনেক কম। বাতাসে যেন কেমন স্যাঁতসেঁতে ভাব।

সারাদিন চটচটে গরমের পর বাতাসটা ভালই লাগছিল টুপুরের। সিটে হেলান দিয়ে বলল, "মিতিনমাসি, এবার কি সিমলাইপাড়া?"

মিতিনের চোখ জানলার বাইরে, গভীর মনোযোগে ভাবছিল কী যেন। হাল্‌কাভাবে বলল, "হুঁ।"

কুশল সামনের সিটে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, "তরুণ বসুকে তোমার কেমন লাগল, মিতিনমাসি? ডক্টর সমাদ্দারের একেবারে উলটো টাইপ না?"

মিতিন নিচু স্বরে বলল, "হুঁ, খুবই ঠান্ডা মানুষ।"

টুপুর বলল, "একটু বেশিই ঠান্ডা। তবে আঙ্কল ঝিয়েনের মৃত্যুতে বড়ই মর্মাহত।"

কুশল বলল, "ওঁর কাছে যাওয়াটা কিন্তু বেকার হল। আঙ্কল ঝিয়েনের ব্যাপারে নতুন কিছুই জানা গেল না। ... আপ্যায়নটা অবশ্য মন্দ হয়নি।"

"ওয়ালহ্যাঙ্গিংয়ের ব্যাপারে একটা পয়েন্ট কিন্তু পাওয়া গিয়েছে।"

"কী বলো তো?"

"যা বাবা, এর মধ্যে ভুলে গেলি? মিষ্টি সাঁটানোর সময় তোর কি কোনও দিকে মন থাকে না?"

"অ্যাই, আওয়াজ দিস না। তুইও দুটো সন্দেশ, একটা রসগোল্লা খেয়েছিস। সেটাও নেহাত কম নয়।"

"তুইও খা না যত খুশি, আনমাইন্ডফুল হোস কেন?" টুপুর গলা নামাল, "তরুণবাবু বলছিলেন, স্বপন দত্তর কাছ থেকে কালেক্ট করা নামটা নাকি রিয়েল হতেও পারে। ওই নামে একজন শিল্পী নাকি সত্যিই ছিলেন। ফিফটিন্‌থ সেঞ্চুরিতে। চিনে তখন মিং বংশের রাজত্ব চলছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে উনি আর-একটা কথাও বললেন। গবেষকরা নাকি অনেক সময় ফেক জিনিসকে মূল্যবান বলে ভুল করেন। ইতিহাসে তো নাকি আকছার এরকম ঘটনা ঘটছে।"

কুশল সন্দিগ্ধ স্বরে বলল, "তার মানে ওয়ালহ্যাঙ্গিংটাও জালি নাকি?"

"কী জানি, উনি তো ওয়ালহ্যাঙ্গিংটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিলেন না।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছিলেন বটে, আঙ্কল ঝিয়েনের খুন হওয়ার সূত্র নির্ঘাত চিনে পাড়াতেই লুকিয়ে আছে।"

"তা হলে তো মহা মুশকিল। লিয়াংয়ের রিলেটিভদেরও ধরে ধরে জেরা করতে হয়। কেসটা কিন্তু আস্তে আস্তে বেশ জটিল হয়ে যাচ্ছে!"

ভাড়াগাড়ি ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস ধরে উত্তরমুখো ছুটছে। এবার ভি-আই-পি রোডে পড়ে, লেকটাউন ভেদ করে, ঢুকবে পাইকপাড়ায়। সিমলাইপাড়া লেন নাকি পাইকপাড়ায়, মিতিনমাসি চেনে।

কুশল বেশিক্ষণ চুপচাপ থাকতে পারে না। আপন মনেই বলে উঠল, "তরুণবাবু কিন্তু বেশ মালদার। কী ঘ্যামা ফ্ল্যাট, দারুণ সাজানো ড্রয়িংরুম, ওয়ালে প্লাজ়মা টিভি... বাসব সমাদ্দারের বাড়ির সঙ্গে আকাশ পাতাল তফাত।"

টুপুর সায় দিল, "তরুণবাবুর গাড়িটাও বিদেশি। রংটা কী সুন্দর! হাঁসের ডানার মতো ধবধবে সাদা!"

"গাড়ি তুই কখন দেখলি?"

"আশ্চর্য, তুই কি অন্ধ নাকি? আমরা রওনা দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তো উনিও বেরোলেন। আমাদের গাড়ির পাশ দিয়েই গেলেন। নিজেই ড্রাইভ করছিলেন। পাশে মিসেস।"

"মনে হয় খানদানি বড়লোক। এখনও ওল্ড বালিগঞ্জে এরকম বনেদি পরিবার অনেক আছে। তাই না মিতিনমাসি?"

অনেকক্ষণ পর মিতিনের গলা পাওয়া গেল, "তোদের দেখছি তরুণবাবুকে খুব পছন্দ হয়েছে!"

"স্বাভাবিক। কী ভদ্র ব্যবহার... এতটুকু অহংকার নেই," টুপুরের স্বরে মুগ্ধতা, "তুমিই বলো, তরুণবাবু তো বাসববাবুর চেয়ে কম পণ্ডিত নন... কিন্তু কোনও খিটকেলপনা করলেন কি?"

"হুম্।"

"তারপর ধরো, সামনের মাসেই উনি বিদেশে সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছেন। অথচ সে খরবটাও কত বিনয়ের সঙ্গে জানালেন।"

"ঠিক।"

"একটা কথা বলি, মিতিনমাসি?" কুশল গলা ঝাড়ল, "আমার মনে হয়, তরুণবাবুর অ্যাডভাইসই আমাদের শোনা উচিত। লিয়াংদের পরিবারের মধ্যেই বোধহয় কোনও গন্ডগোল আছে। একটা ডিটেকটিভ উপন্যাসে পড়েছিলাম, এক চিনা পরিবারেরই কোনও জ্ঞাতিভাই তিন পুরুষ আগের ঝগড়ার ঝাল মেটাতে..."

"আমি কোনও আশঙ্কাই উড়িয়ে দিচ্ছি না, কুশল। মিস্টার ঝিয়েনের স্কুলেও একবার আমাদের যেতে হবে। যত বেশি ডেটা হাতে আসবে, সত্যের কাছে পৌঁছোতে তত সুবিধে। তবে আপাতত এখন শিবতোষ রায়কে তো মিট করে আসি।"

সিমলাইপাড়ায় এসে শিবতোষ রায়ের বাড়ি খুঁজতে কোনও সমস্যাই হল না। পাড়ার সবাই তাঁকে চেনে। একজনকে জিজ্ঞেস করেই পৌঁছোনো গিয়েছে গন্তব্যস্থানে।

শিবতোষ রায় বাড়িতেই ছিলেন। মিতিনদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। বাসববাবুর বাড়িতে অভ্যর্থনার বহর দেখে মিতিন আর ঝুঁকিতে যায়নি, আগেই ফোনে সময় চেয়ে নিয়েছিল শিবতোষবাবুর কাছ থেকে। বেল বাজাতে তিনি নিজেই দোতলা থেকে নেমে দরজা খুলেছেন।

মিতিন হাত জোড় করে নমস্কার করল ভদ্রলোককে। স্মিত হেসে শিবতোষবাবু বললেন, "আমি কিন্তু আপনাকে একটু একটু চিনি।"

"কীভাবে?"

"আপনার একটা কেস ডিটেকশন কাগজে খুব মন দিয়ে পড়েছি। সেই যে... শ্বশুর পুত্রবধূকে টাকার জন্য ব্ল্যাকমেল করত..."

"সে তো প্রায় চার বছর আগের ঘটনা। আপনার মনে আছে?"

"সাল, তারিখ, নাম, ঘটনা... এসব মনে রাখাই তো আমাদের পেশা। ...আসুন ...ভেতরে আসুন।"

একতলাতেই ড্রয়িংরুম। বাসববাবুর মতো অগোছালোও নয়, আবার তরুণবাবুর মতো ঘ্যামচ্যাকও নয়, ছিমছাম। ঘরের আসবাব পুরনো ধাঁচের হলেও পরিচ্ছন্ন। দেওয়ালে গাঁথা কাচের আলমারিতে শুধু ইতিহাসের বই নয়, রবীন্দ্র-বঙ্কিম-শরৎ রচনাবলিও দৃশ্যমান।

টুপুররা সোফায় বসতে না-বসতেই শরবত এসে গেল।

শিবতোষবাবু বসেছেন টুপুরদের উলটো দিকে। বয়স বড়জোর বছর পঞ্চাশ। রোগা, লম্বা চেহারা, গায়ের রং তামাটে। সরু একখানা গোঁফও আছে, শুঁয়োপোকার মতো। মিতিনদের শরবত শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ভদ্রলোক, গ্লাস খালি হতেই বললেন, "বলুন ম্যাডাম, কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি?"

মিতিন ঝুঁকে বসল, "ফোনেই তো বললাম... মিস্টার ঝিয়েনের সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে চাই।"

শিবতোষবাবু দু'-এক সেকেন্ড চোখ বুজে থেকে বললেন, "আমার সঙ্গে ঝিয়েনের আলাপ বছর পাঁচেক আগে। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। আমি কুবলাই খাঁ'র উপর একটা বই খুঁজছিলাম। পাচ্ছিলাম না। রোজই শুনতাম কে একজন যেন ইসু করে নিয়ে রিডিংরুমে চলে গিয়েছে। খুঁজে খুঁজে দেখি, ঝিয়েন। বইটাকে ও

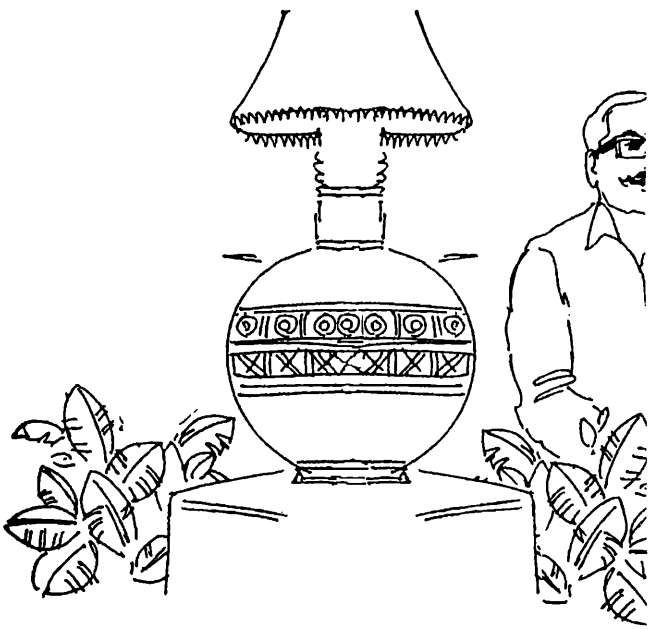

নিজের কাজের রেফারেন্স হিসেবে ইউজ় করছিল। সেদিন থেকেই পরিচয়। আমাদের দু'জনেরই গবেষণার বিষয়ে বেশ লিঙ্ক ছিল, তাই মোটামুটি জমেও গেল।"

"আপনি কী নিয়ে কাজ করছেন?"

"বর্তমানে আমার বিষয়, চিনের উপর বিদেশি আক্রমণের প্রভাব। টাইম টু-টাইম, বহু বহিরাগতই তো চিন আক্রমণ করেছে... তাতে চৈনিক সংস্কৃতির উপর কী ধরনের প্রভাব পড়েছে..."

"আর মিস্টার ঝিয়েন?"

"চিনারা কীভাবে বহির্বিশ্বে ছড়িয়েছে। ভেরি ইন্টারেস্টিং। ঝিয়েন অনেক ভাল ভাল তথ্য জোগাড় করেছিল। যত্ন করে সিস্টেমেটিক্যালি কম্পাইল করত। অত্যন্ত সিনসিয়ার। ভারী বিদ্যানুরাগী। অ্যাকাডেমিক্যালিও খুব সাউন্ড ছিল তো।"

"মিস্টার ঝিয়েন তো পিএইচডি, টিএইচডি করেননি?"

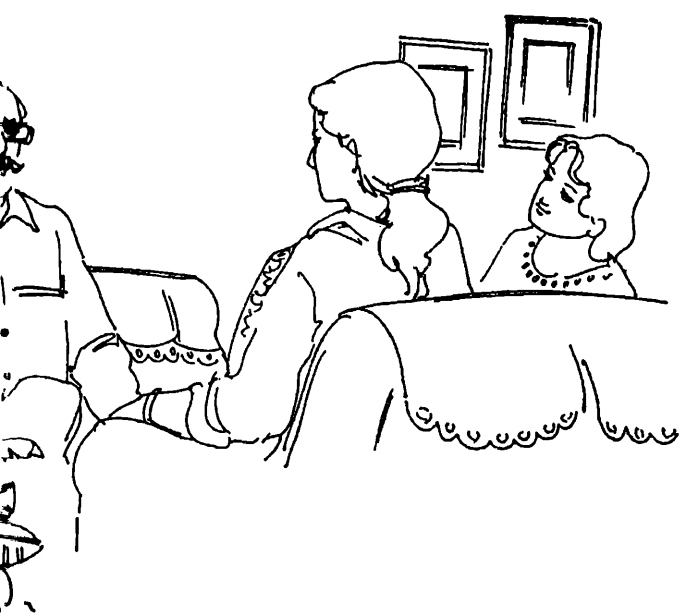

"ডিগ্রিফিগ্রির ওপর ওর আগ্রহই ছিল না। থাকলে তো কবেই ডক্টরেট হয়ে যেত। সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে অত ভাল মার্ক্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন, এম-এ'তে হিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস... এরকম ছাত্র পেলে তো যে-কোনও গাইড লুফে নিত। প্রথাগত গবেষণায় না-গিয়েও ঝিয়েন অবশ্য কাজ করে যাচ্ছিল। একটা ব্যাপার তো ঝিয়েন প্রমাণই করে দিয়েছে। ইউরোপিয়ানরা চিনাদের যে ইতিহাস তৈরি করেছে, তা একেবারেই অসম্পূর্ণ এবং অনেকটাই ভুল।"

"যেমন?"

"যেমন, নেভিগেশন বা জলপথে চলাচলের ব্যাপারটায় চিনারা ইউরোপিয়ানদের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে ছিল। তার নিখাদ প্রমাণ হল, নৌকোর সাইজ়। ইউরোপের বিখ্যাত নৌ অভিযাত্রীদের নৌকো যেখানে তিরিশ ফিট থেকে মেরেকেটে চল্লিশ, সেখানে চিনারা একশো ফিটের চেয়ে বড় নৌকো নিয়ে সমুদ্রে ঘুরত। অবশ্য পাল বাঁধার ব্যাপারটা চিনারা খুব ভাল জানত না। তবে দিকনির্ণয়ে ওদের ভুলচুক হত না কোনও। ইউরোপিয়ানরা তো প্রমাণ করতে চান, পৃথিবীটাকে ওঁরাই সভ্য করেছেন। কথাটা যে কত ভুল..."

শিবতোষবাবু কথা শুরু করলে আর থামতেই চান না। মিতিন তাঁকে কোনওক্রমে রুখল। বলল, "আচ্ছা, সম্প্রতি মিস্টার ঝিয়েন একটা ওয়ালহ্যাঙ্গিং কিনেছিলেন। আপনি কি সে ব্যাপারে কিছু জানেন?"

"ওই বস্তুটি কেনার পরেই তো মিসহ্যাপটা ঘটল, এবং দুর্ভাগ্যবশত জিনিসটাও লোপাট। খুব ক্ষতি হয়ে গেল... খুব ক্ষতি হয়ে গেল..."

"কেন?"

"ওটা আসলে কী জানেন? মো-ই-টং-এর আঁকা ম্যাপ। মিং ডাইনেস্টির সেই ফেমাস আর্টিস্ট..."

"তরুণবাবুও বলছিলেন উনি খুব বিখ্যাত শিল্পী..."

"তরুণ তো জানবেই। তরুণ তো ঝিয়েনের লাইনেই কাজ করছে। ইস, ওই ম্যাপটা হাতে থাকলে কত দিনের একটা মিথ্যে প্রচার যে নস্যাৎ করা যেত!"

টুপুর হতভম্ব মুখে বলে উঠল, "ওই ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা শুধুই একটা ম্যাপ?"

"মোস্ট প্রবাবলি। ঝিয়েন ভুল করার লোক নয়। ইস, ম্যাপটা আমার আর দেখা হল না।"

"ওটা কীসের ম্যাপ ছিল স্যার?"

"পৃথিবীর।"

এবার মিতিনও স্তম্ভিত। অস্ফুটে বলল, "মানে?"

"এককথায় বলা কঠিন। বলা যেতে পারে, ওটাই গোটা পৃথিবীর প্রথম অথেন্টিক মানচিত্র।"

"ঠিক বুঝলাম না, স্যার।"

"তা হলে একটু ইতিহাসে ঢুকতে হয়।... থারটিন্‌থ সেঞ্চুরিতে চেঙ্গিস খাঁর নাতি কুবলাই খাঁ চিন দখল করেছিল। তাদের হটিয়ে প্রায় একশো বছর পর মিংদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মিংদের আমলকে বলা হয় চিনের স্বর্ণযুগ।"

কুশল বলল, "জানি। ওই সময় চাইনিজ় ওয়াল তৈরি হয়েছিল।"

"আরও অনেক কিছুই হয়েছিল। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, সবেতেই তখন চিনের রমরমা। মিং রাজত্ব প্রতিষ্ঠার একশো বছর পরে এক বিখ্যাত চিনা অভিযাত্রীর জন্ম হয়। সালটা তেরোশো একাত্তর। তাঁর নাম মা-সান-পাও। ইতিহাস তাঁকে জানে অ্যাডমিরাল জেং নামে। শৈশব থেকেই বেচারা অনাথ। বড় হয়ে তিনি হলেন রাজা ইয়ং-লোর এক সৈনিক। রাজা তাঁকে খুব ভালবাসতেন। নৌযোদ্ধা হিসেবে তাঁর খুব নাম হয়েছিল বলে রাজা

তাঁকে নৌবাহিনীর বড় পদে বসান। তারপর হঠাৎই একদিন হুকুম দেন, তোমাকে আর যুদ্ধটুদ্ধ করতে হবে না, তুমি চিনের প্রতিনিধি হয়ে দেশে দেশে ঘোরো, আর পারলে নতুন নতুন জায়গা খুঁজে বের করো। ...তারপর থেকে শুরু হল জেংয়ের নৌঅভিযান। একবার নয়, সাত-সাত বার বেরিয়েছিলেন তিনি। প্রথম বার গিয়েছিলেন মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে। সঙ্গে ছিল বাষট্টিটা জাহাজ আর সাতাশ হাজার আটশো মতো অনুচর।"

"আরিব্বাস!" কুশলের চোখ কপালে, "এটাই তো একটা নৌবহর।"

"বলতে পারো। প্রথমবার জেং গিয়েছিলেন ভিয়েতনাম, মালাক্কা, জাভা, শ্রীলঙ্কা। ...আমাদের কোচিন-কালিকটেও এসেছিলেন। ভাস্কো-দা-গামার তিরান্নবই বছর আগে। সেই জেং-ই তাঁর ষষ্ঠ অভিযানের সময় আফ্রিকাটাফ্রিকা পেরিয়ে, অতলান্তিক পাড়ি দিয়ে, পৌঁছেছিলেন আমেরিকায়। চোদ্দোশো একুশ সালে। আমরা কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের গল্প শুনি। কলম্বাস কিন্তু তখনও জন্মাননি।"

টুপুর প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "বলছেন কী স্যার? কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেননি?"

"আমেরিকা আবার আবিষ্কার করার কী আছে? আমেরিকা বলে দেশটা তো ছিলই। সেখানে অন্তত তিরিশ হাজার মানুষ থাকত। ইনকা, আজটেকের মতো উন্নত সভ্যতা ছিল সেখানে। শুধু তাই নয়, ভাইকিংরা... মানে যারা ইউরোপের উত্তর দিকে থাকত... প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চেহারা... জলদস্যু হিসেবে যাদের খুব বদনাম ছিল... তারাও কলম্বাসের আগে আমেরিকা গিয়েছিল। কলম্বাসকে অকারণে হিরো করা হয়েছে। যাই হোক, ওই মো-ই-টং ছিলেন জেং-এর সঙ্গী। ম্যাপ আঁকার কাজে দারুণ তুখোড় ছিলেন মো। তিনি দেশে দেশে ঘুরতে

ঘুরতে আস্ত একখানা ম্যাপ বানিয়ে ফেলেছিলেন পৃথিবীর। অবশ্য ফু শাংয়ের বানানো মানচিত্র তাঁকে হেল্প করেছিল।"

"ফু শাং নামটা শুনেছি না?" টুপুর কুশলের দিকে তাকাল, "মেইলি বলছিল না?"

"হ্যাঁ তো।" কুশল ঢকঢক ঘাড় নাড়ল। শিবতোষবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "ফু শাং কে স্যার?"

"তিনিও এক জলের পোকা। তিনি সমুদ্রে চক্কর খেয়েছিলেন সপ্তম শতাব্দীতে। চিনে ফু শাংকে একজন প্রাবদপুরুষ বলে মানা হয়।"

টুপুর বলল, "বেশ তো, এসব নয় বুঝলাম। কিন্তু ম্যাপটা আমাদের দেশে এল কীভাবে?"

"বলা খুব কঠিন। ইন ফ্যাক্ট, ম্যাপটা তো থাকারই কথা নয়।"

"কেন?"

"সে আর-এক ইতিহাস। ষষ্ঠ বার সমুদ্র অভিযান শেষ করে জেং যখন দেশে ফিরলেন, তখন রাজা ইয়ং লো মারা গিয়েছেন। নতুন রাজা হয়েছেন হুং শি। তিনি সিংহাসনে বসার পর একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। হঠাৎ একদিন বাজ পড়ে রাজপ্রাসাদ চৌচির। রাজার মন্ত্রণাতাদারা তখন রাজামশাইকে বোঝাল, ওই সমুদ্র অভিযানই নাকি যত নষ্টের গোড়া। ওই জন্যই নাকি বজ্রের দেবতা কুপিত হয়েছেন। ব্যস, যায় কোথায়, অমনই রাজা জেংয়ের উপর চটে লাল। ফের সমুদ্রে যাওয়া তো বন্ধ হলই, জেংয়ের কাছ থেকে সব কাগজপত্র, নথিটথি, কেড়ে নিয়ে রাজামশাই জ্বালিয়ে দিলেন। ওই ম্যাপটাও তখনই পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার কথা। তবে মো ছিলেন ধুরন্ধর, বিপদের গন্ধ পেয়ে আগে ভাগে সরিয়ে ফেলেছিলেন ম্যাপটা। তারপর থেকে ওটা লুকোনোই ছিল। প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পর ওই মো-র বংশধররাই ম্যাপটার গোটা চার-পাঁচ কপি

করান। যাতে ভবিষ্যতে মানচিত্রটা নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায়। সম্ভবত ঝিয়েনের কেনা মানচিত্রখানা ওই কপিগুলোরই একটা।"

শিবতোষবাবু থামলেন। মিতিন নিশ্চুপ হয়ে শুনছিল, হঠাৎই তার স্বর ফুটেছে, "হুম্, এটা খুবই সম্ভব। মোটামুটি ওই সময় থেকেই তো বেঙ্গলে চিনারা আসতে আরম্ভ করে। তাদের কেউই হয়তো নিয়ে এসেছিল ম্যাপখানা।"

"হয়তো নয়, তাই হয়েছে।" শিবতোষবাবু দৃঢ় স্বরে বললেন, "ঝিয়েন আমাকে জিনিসটার যা বর্ণনা দিয়েছিল..."

কথায় ব্যাঘাত ঘটল। শিবতোষবাবুর স্ত্রী এসেছেন দরজায়। বললেন, "গ্যারাজের লোক অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে। গাড়ি রঙের কাজ শেষ। পেমেন্ট দিতে হবে।"

শিবতোষ সামান্য অসন্তুষ্ট মুখে বললেন, "তুমিই চেক কেটে দাও না।"

"রং-টা একবার দেখে নেবে না?"

"দরকার নেই। তুমি তো দেখেছ।"

স্ত্রী দরজা থেকে সরে যেতেই আবার সৌম্য ভাব ফুটেছে শিবতোষবাবুর মুখে। হাসিহাসি মুখে টুপুরদের বললেন, "তোমাদের একটা ভাল হিস্ট্রির ক্লাস হয়ে গেল, কী বলো?"

কুশলের ঘাড় পেন্ডুলামের মতো দুলছে, "সে তো বটেই।"

মিতিন বলল, "তা হলে স্যার, বোঝা যাচ্ছে, ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা ছিল খুবই মূল্যবান। যার জন্য একটা মানুষ খুনও হয়ে যেতে পারেন?"

"অবশ্যই। জিনিসটার দাম টাকায় মাপা যাবে না।" বলেই শিবতোষবাবুর চোখ পিটপিট, "হঠাৎ খুনের কথা বললেন কেন? তবে কি ঝিয়েনের মৃত্যুটা...?"

"হ্যাঁ স্যার। মিস্টার ঝিয়েনকে মেরে ফেলা হয়েছে।"

"ও নো।" শিবতোষবাবু দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। মিনিটখানেক পর

আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়েছেন। বিড়বিড় করে বললেন, "আমার বোঝা উচিত ছিল... আমার বোঝা উচিত ছিল। জিনিসটা যখন উধাও হয়েছে, তখনই তো..."

শিবতোষের স্বর আটকে গেল। গোটা ঘর নিঝুম, মাথার উপর ফ্যান ঘোরার আওয়াজটাই যা শোনা যাচ্ছে শুধু।

মিতিন নীরবতা ভাঙল, "ভেঙে পড়বেন না স্যার। যা ঘটার তা তো ঘটেই গিয়েছে। এখন আপনাকে শক্ত হতে হবে। নিশ্চয়ই আপনি চান কালপ্রিট ধরা পড়ুক।"

শিবতোষবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "বেচারা ঝিয়েন। পুয়োর সোল।"

"আরও একটা-দুটো প্রশ্ন করি স্যার? আপনার সঙ্গে মিস্টার ঝিয়েনের লাস্ট কবে দেখা হয়েছিল?"

"অ্যাকসিডেন্টের আগের দিনই।"

"কোথায়?"

"ইউনিভার্সিটিতে। আমার রুমে। ও তো ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আসতই, তখন উলটো দিকে আমাদের হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টেও একবার ঢুঁ মেরে যেত। ...সেদিন ঝিয়েন অসম্ভব এক্সাইটেড ছিল। বলছিল, সোমবার দিনই আমাকে জিনিসটা দেখিয়ে যাবে।

"কত টাকায় জিনিসটা উনি কিনেছিলেন, আপনি জানেন?"

"এগজ়াক্ট অ্যামাউন্ট বলতে পারব না। তবে ও বলেছিল, জলের দরে।"

"আর-একটা প্রশ্ন। ডক্টর বাসব সমাদ্দার... ডক্টর তরুণ বসু... এঁদের তো আপনি চেনেনই। এঁরা মানুষ হিসেবে কেমন?"

শিবতোষবাবুর চোখ সরু হল, "ঠিক কী জানতে চাইছেন বলুন তো?"

"তা হলে স্পষ্ট করেই বলি। আপনার কি মনে হয়, ওই

মহামূল্যবান জিনিসটার জন্য এঁরা কেউ... কোনও ভাবে... মিস্টার ঝিয়েনকে...?"

"কী যে বলেন আপনি! তা হলে তো আমাকেও সন্দেহ করতে হয়।"

"ধরুন করছি," মিতিন হাসল, "এবার বলুন।"

"দেখুন, এঁরা দু'জনেই বিদ্বান মানুষ। ইতিহাসবিদ হিসেবে এঁদের নামও আছে। এঁদের মধ্যে তরুণ খুব মেথডিক্যাল, অ্যাম্বিশাস..."

"আর বাসববাবু?"

"আই ওন্ট কমেন্ট।"

"কেন?"

"উনি একটু পিকিউলিয়ার। মাঝে মাঝেই উলটোপালটা কাণ্ডকারখানা করে বসেন। এই কেসের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, তবু বলি... উনি একবার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বইয়ের পাতা কাটতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন। খোঁজ নিয়ে দেখবেন, ব্যাপারটা থানা-পুলিশ অবধি গড়িয়েছিল।"

"লাস্ট কোয়েশ্চেন ...মিস্টার ঝিয়েন হঠাৎ প্রিন্সেপ ঘাটে কেন গিয়েছিলেন, সে-ব্যাপারে কোনও আইডিয়া করতে পারেন?"

শিবতোষ রায় স্থির চোখে তাকালেন, "না। আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।"

পরদিন বিকেলে টুপুর সবে স্কুল থেকে ফিরেছে, কুশল লাফাতে লাফাতে উপস্থিত। চকচকে চোখে বলল, "এই জানিস, মিতিনমাসির আন্দাজই ঠিক।"

টুপুর ভারিক্কি মুখে বলল, "মিতিনমাসি কখনওই ভুলভাল গেস করে না।"

"তাই তো দেখছি। লিয়াংরা সত্যিই কাল খবর পেয়ে গিয়েছে। পুলিশ কাল বিকেলেই লিয়াংয়ের বাবাকে জানিয়ে দিয়েছে আঙ্কল ঝিয়েনের মৃত্যুটা অ্যাকসিডেন্ট নয়, হোমিসাইড।"

"লিয়াংরা তো আগেই সন্দেহ করেছিল। পুলিশ তো জাস্ট কনফার্ম করল।"

"তা ঠিক। তবে ওর বাবা নাকি একদম গুম হয়ে গিয়েছেন। কারও সঙ্গে কথাই বলছেন না।"

"ওরকম হয়। সন্দেহটা সত্যি বলে প্রমাণ হলে একটা বড় ধাক্কা তো লাগেই ...লিয়াংকে আমাদের কালকের কথাগুলো বললি?"

"হুঁ।"

"শুনে কী রিঅ্যাকশান?"

"বোঝা গেল না। ওর মুখে তো সহজে এক্সপ্রেশন ফোটে না। তবে খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছিল। তোর কী মনে হয় রে? কাল অত ঘোরাঘুরি করে কোনও লাভ হল?"

"জ্ঞান বাড়ল। ডেটা জমল।"

"কাজের কাজ কিছু হল কী?"

"নিশ্চয়ই হয়েছে। মিতিনমাসি মিছিমিছি ছোটাছুটি করে না।"

"তার মানে কাল যাদের মিট করলাম, তারা যে-কেউ কালপ্রিট হতে পারে?" কুশল নাক কুঁচকোল, "অবশ্য একটা ডিটেকটিভ বইয়ে পড়েছিলাম, একজন প্রোফেসর রাত্তিরবেলা একদম বদলে যেত। তখন সে ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, সব কিছু করতে পারত। হয়তো ওই তিনজনের মধ্যে একজন ওরকম দু'মুখো মানুষ!"

"হতে পারে। আবার না-ও হতে পারে। তবে ওঁদের সঙ্গে বাতচিত করে একটা তো লাভ হয়েছে। ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা যে একটি মহামূল্যবান বস্তু সেটা তো জানা গেল। আর ওটা কেনার পরে মৃত্যু, মানে ওটা কেনার জন্যেই মৃত্যু। এবং ওটা খোওয়া যাওয়াও কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়। মোটিভ ইজ় ক্লিয়ার। এবার শুধু খেলিয়ে খেলিয়ে তোলার অপেক্ষা।"

"অত সোজা নয় রে টুপুর। এখনও মিতিনমাসিকে প্রচুর দৌড়োতে হবে। আঙ্কল ঝিয়েনের স্কুল আছে। তাঁর সহকর্মীদের কে কেমন আমরা জানি না..."

"কিন্তু তারা কি কেউ জিনিসটার দাম জানে? গুরুত্ব বোঝে?"

অবনী উঁকি দিয়েছেন টুপুরের ঘরে। সদ্য কলেজ থেকে ফিরেছেন, এখনও পোশাক বদলাননি। দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, "কী-ই, তোমাদের চাইনিজ়-পাজল কদ্দুর? একটাও গিঁট খুলল?"

কুশল বলল, "না মেসোমশাই। সুতো টানাটানি চলছে।"

"এবং গিঁট আরও শক্ত হচ্ছে। তাই তো?" অবনী ঢুকে পড়লেন ঘরে, "আমি কিন্তু তোমাদের কেসে খানিকটা হেল্প করতে পারি।"

"কীভাবে?"

"তোমরা তো কাল জেনে এলে কিউরিও শপের মালিকের কোনও পূর্বপুরুষ নাকি এক চিনেম্যানের কাছ থেকে ওয়ালহ্যাঙ্গিং...

থুড়ি, ম্যাপটা পেয়েছিল। আমি গ্যারান্টি দিতে পারি, লোকটা এই কথাটা অন্তত মিথ্যে বলেনি।"

টুপুর বলল, "কোন যুক্তিতে বলছ?"

"কারণ, বজবজের দিকটায় সত্যিই একসময় চাইনিজ় কলোনি ছিল। প্রপার বজবজ নয়, তার কাছাকাছি। জায়গাটার নাম এখন অছিপুর। এই অছিপুর নামটা কীভাবে হয়েছিল জানিস? আজ থেকে প্রায় সওয়া দুশো বছর আগে আৎসু নামে এক ক্যান্টনি চিনা জাহাজভরতি চা নিয়ে বাণিজ্যে যাচ্ছিল। পথে হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড়। ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজ সরতে-সরতে এসে পড়ল বজবজের গঙ্গায়। জাহাজ গিয়েছে ভেঙে, তাই আৎসুকে বজবজেই নামতে হল। এক্কেবারে অচেনা জায়গা, অজানা ভাষা... আৎসুর তো মাথা খারাপ হওয়ার দশা। তবে জায়গাটা ওর খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। তা তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ওয়ারেন হেস্টিংস কোম্পানির গভর্নর জেনারেল। আৎসু তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে চা-টা খাওয়াল, নিজের অবস্থাটা বোঝাল। হেস্টিংস তো চা খেয়ে বেজায় খুশি। আৎসুকে একটা ঘোড়া দিয়ে বললেন, 'এক ঘণ্টায় যতটা জায়গা বেড় দিয়ে আসতে পারবে, সবটাই তোমার।' ব্যস, জমিজমা পেয়ে আৎসু থেকেই গেল। বজবজের কাছে একটা চিনির কারখানা খুলেছিল আৎসু। চিনে তখন ঘোর দুঃসময়, দুর্ভিক্ষ, মড়ক, দাঙ্গা লেগেই আছে। আৎসু সুযোগ বুঝে চিন থেকে সস্তায় লেবার আনতে শুরু করল চিনির কলে। ওই চিনিকল ঘিরেই তৈরি হল আৎসুপুর। চিনা মহল্লা। সেই আৎসুপুরই মুখে মুখে অছিপুর।"

কুশল বলল, "কিন্তু ওদিকে কি এখন আর চিনা আছে? শুনি না তো?"

"যারা ছিল, তাদের বংশধররা সবাই এখন কলকাতায়। আৎসুর চিনিকলটা তো চলেনি। পাঁচ-ছ'বছরের মধ্যে আৎসুও মারা গেল,

চিনিকলও ডকে উঠল। আর ওখানকার চিনারাও ধীর ধীরে সরে এসে ডেরা বাঁধল কলকাতায়। ...মনে হয় ওই আৎসুর সময়েই, কিংবা তার দশ-বিশ বছর পরে, কিউরিও শপের মালিকের পূর্বপুরুষের কপালে জুটেছিল ওই ম্যাপখানা। কিউরিও শপের মালিক এত ইতিহাস জেনে, সেইমতো সাজিয়েগুছিয়ে মিথ্যে বলবে — অসম্ভব।"

টুপুর বলল, "আমারও ওর কথার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল সত্যিই বলছে।"

অবনী হেসে বললেন, "আমার এই ইনফরমেশনটা তা হলে তোমার ডিটেকটিভ মাসিকে পাস করে দিও।"

চিনাদের নিয়ে আরও খানিকক্ষণ আড্ডা চলল তিনজনের। লিয়াংয়ের আবির্ভাবের পর থেকে চিনাদের সম্পর্কে অসম্ভব আগ্রহ বেড়ে গিয়েছে অবনীর। এখন তিনি অবিরাম জ্ঞানভাণ্ডার বাড়িয়ে চলেছেন। বছরে চিনাদের ক'টা বড় উৎসব হয়, কোন উৎসবের পিছনে কী গল্প আছে, কোনটাকে চিনারা শুভ বলে মানে, কোনটা অশুভ — সব তিনি সংগ্রহ করে ফেলেছেন ইন্টারনেট থেকে। অবনীর দৌলতেই টুপুররা জানতে পারল, চিনারা বেগুনকে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করে।

কুশল বাড়ি গেল সাড়ে ছ'টা নাগাদ। টুপুর বসল অ্যালজেব্রা নিয়ে। সন্ধের দিকেই অঙ্কটা তার আসে ভাল, রাত বাড়লে উত্তর আর কিছুতেই মিলতে চায় না। পুরো একটা প্রশ্নমালা শেষ করে, খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে, সবে একটু টিভির সামনে বসেছে, হঠাৎই ফোনের ঝনাৎকার। সহেলি রিসিভার তুলেছিলেন, কানে চেপেই আঙুল নেড়ে ডাকলেন টুপুরকে, "ধরো। তোমার চিনে বন্ধু।"

টুপুর একটু অবাকই হল। তবে স্বরে ফুটতে দিল না বিস্ময়। স্বাভাবিকভাবেই বলল, "হাই!"

"হাই! গুড ইভনিং। আমি কি তোমাকে ডিসটার্ব করলাম?"

"নট অ্যাট অল। কী বলছ বলো?"

"আমার পাপা তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান।"

টুপুর চমকাল। কী বলবেন লিয়াংয়ের বাবা?

ওপারে লিয়াংয়ের বাবার গলা শোনা গেল। কেমন যেন মিয়োনো-মিয়োনো, "হ্যালো, মাই চাইল্ড!"

"ইয়েস আঙ্কল।"

"লিয়াংয়ের মুখে শুনলাম তোমরা কাল সারাদিন অনেক দৌড়োদৌড়ি করেছ। তোমার মাসি আমার ভাইয়ের মৃত্যুর তদন্ত করছেন। তাঁকে বোলো, এই হতভাগ্য মানুষটা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।"

"কৃতজ্ঞতার কিছু নেই আঙ্কল। লিয়াং আমার বন্ধু। তার বাড়ির একটা বিপদে আমরা সবাই তার পাশে থাকব, এটাই তো স্বাভাবিক।"

"নো মাই চাইল্ড। এটা তোমার মাসির মহানুভবতা। তিনি এক পেশাদার গোয়েন্দা। তাঁর মূল্যবান সময় আমার ভাইয়ের জন্য তিনি খরচ করছেন। তাঁকে বোলো, তাঁর যথাযোগ্য পারিশ্রমিক আমি হয়তো দিতে পারব না, তবু কথা দিচ্ছি, আমার ভাইয়ের হত্যাকারীকে ধরে দিলে তিনি যে-অঙ্কই চাইবেন, আমি দেব।"

"ছি ছি, পারিশ্রমিকের কথা উঠছে কেন আঙ্কল? মাসি তো আমাদের ভালবেসে... লিয়াংয়ের কথা ভেবে..."

"ঠিক কথা। গাছ কখনও প্রতিদানের আশায় ফল দেয় না। কিন্তু মানুষের তো গাছের প্রতি কর্তব্য আছে। তুমি মাসিকে আমার মিনতিটা জানিও। তাঁকে আরও বোলো, ঝিয়েনের মৃত্যুতে আমার পাঁজরের একটা হাড় খসে গিয়েছে। অপরাধী ধরা না-পড়লে আমার যন্ত্রণা কমবে না।"

অত্যন্ত শান্ত স্বরে কথাগুলো বলছেন লিয়াংয়ের বাবা। কিন্তু

শুনতে শুনতে টুপুরের গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। ঢোক গিলে বলল, "নিশ্চয়ই বলব, আঙ্কল।"

"আর একটা অনুরোধ। যে ম্যাপটার কথা তোমরা শুনেছ, সেটা কিন্তু চিনাদেরই সম্পত্তি। কোনও একজন বাঙালিকে আমাদেরই কেউ একসময় উপহার দিয়েছিলেন। ওটা আবার আমরা ফেরত পেলে বিশেষ খুশি হব। আমার ভাইয়ের আত্মাও শান্তি পাবে।"

"আমি বলব মাসিকে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"শুভরাত্রি। প্রার্থনা করি, শয়তান যেন তোমার ঘুমে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না-পারে।"

টুপুরও গুডনাইট বলতে যাচ্ছিল, দুম করে কাজের কথাটা মনে পড়ে গেল। কাজটা কুশলেরই করার কথা, তবে সে নির্ঘাত ভুলে মেরে দিয়েছে।

ব্যস্তভাবে টুপুর বলে উঠল, "এক সেকেন্ড, আঙ্কল, এক সেকেন্ড।"

"বলো, মাই চাইল্ড?"

"আমার মাসি একটা কথা জানতে চেয়েছিল।"

"কী?"

"আঙ্কল ঝিয়েনের মোবাইল নাম্বারটা কী ছিল?"

"নোট করে নাও। নাইন এইট থ্রি..."

ফোন রেখে একটুক্ষণ ঝুম হয়ে বসে রইল টুপুর। মিতিনমাসিকে কি এখনই জানাবে লিয়াংয়ের বাবার কথাগুলো? ইচ্ছে করছে না। হঠাৎই মনটা কেমন ভারী হয়ে গিয়েছে।

রাতে অবশ্য বেশ গাঢ় ঘুম হল টুপুরের। লিয়াংয়ের বাবার শুভকামনায় কী? অন্য দিন বেশ স্বপ্নটপ্ন দ্যাখে, আজ সেসবের বালাই নেই।

সকালে নিদ্রা ভঙ্গ হতে না হতেই নতুন চমক। খবরের কাগজের

প্রথম পাতায় চাঞ্চল্যকর সংবাদ। অবনীই ডেকে তুলে দেখালেন টুপুরকে। চিনা ইতিহাসবিদ ঝাও ঝিয়েনের হত্যাকারী সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

নামটা পড়ে টুপুর প্রায় ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। মন্টু! কিউরিও শপের মালিক স্বপন দত্তর সেই ছোকরা কর্মচারী!

টুপুর ভাবছিল মিতিনমাসিকে একটা ফোন করবে, তার আগেই দূরভাষে মিতিনমাসি স্বয়ং।

টেলিফোন কানে চেপে টুপুর হাউমাউ করে উঠল, "আজকের কাগজটা দেখেছ?"

"মন্টুকে গ্রেপ্তার? হুঁ, চোখে পড়ল।" মিতিনের কোনও ভাবান্তর নেই, "আজ তোর ক'টা অবধি স্কুল রে?"

"আজ তো শনিবার। একটায় ছুটি।" টুপুর ফের প্রসঙ্গে ফিরল, "এটা কেমন হল, মিতিনমাসি? একটা নিরীহ ছেলেকে পুলিশ অকারণে হ্যারাস করবে? মালিকটাকে পাকড়াও করলেও না হয় কথা ছিল।"

"কিছুই অকারণে ঘটে না টুপুর। বাতাস ছাড়া গাছের পাতা নড়ে না।"

"কিন্তু তোমার যুক্তি কী বলে? আঙ্কল ঝিয়েন যেদিন জিনিসটা কেনেন, মন্টু তো সেদিন কাজেই আসেনি!"

"তাতে কিস্‌সু প্রমাণ হয় না। নিশ্চয়ই পুলিশ কিছু একটা ভেবে তুলে নিয়ে গিয়েছে। ...যাক গে, পুলিশের কাজ পুলিশকে করতে দে, আমরা আমাদের মতো এগোই।" মিতিন আবার একটু থেমে

থেকে বলল, "কাজের কথা শোন। দিদিকে বলে দে, তুই আজ স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিস না। আজ আর কাল আমার এখানে থাকবি, পরশু মেসো তোকে স্কুলে পৌঁছে দেবে। ছুটির পর স্কুলগেটে দাঁড়াস, আমি তোকে তুলে নেব।"

"কোথায় যাব গো আমরা?"

"মিস্টার ঝিয়েনের কর্মক্ষেত্রে। কুশল যদি আগ্রহী থাকে, তাকেও সঙ্গে নিতে পারিস।"

"ওদের সেন্ট পিটার্সে তো শনিবার হলিডে। কুশল মনে হয় বাড়িতেই থাকবে।"

"ওকেও তা হলে তোর স্কুলের সামনে চলে আসতে বল। কাঁটায় কাঁটায় একটায়।"

"ঠিক আছে। ...ইস, বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম। লিয়াংয়ের বাবা কাল রাতে ফোন করেছিলেন। উনি বলছিলেন..."

"পরে শুনব। তাড়া আছে। ছাড়ছি।"

ফোন রেখে বোঁ করে একখানা পাক খেয়ে নিল টুপুর। কী মজা! আজ আর কাল, দুটো দিন, উত্তেজনার আগুনে বেশ সেঁকে নেওয়া যাবে নিজেকে! মিতিনমাসি নিশ্চয়ই কোনও পরিকল্পনা করছে... টুপুরকে কি আর একটুও বলবে না?

সহেলি অবশ্য প্রস্তাবটা শুনে খুব প্রীত হলেন না। গজগজ করতে করতে গুছিয়ে দিলেন টুপুরের জামাকাপড়। কড়া গলায় বললেন, "যাচ্ছ যাও। কিন্তু কোনও অজুহাতেই সোমবার স্কুল ডুব দেওয়া চলবে না।"

স্কুলে গিয়েও টুপুরের মন উচাটন। কখন একটা বাজে!

মিতিন আজ এল ট্যাক্সিতে। কুশলও সময়মতো পৌঁছেছিল, টুপুর আর কুশলকে তুলে নিয়ে স্টার্ট দিল ট্যাক্সি। টেরিটিবাজারের দিকে চলেছে।

স্কুলের নাম নানকিং হাই স্কুল। দোতলা বাড়ি, খুব একটা প্রকাণ্ড নয়। চেহারাও বেশ মলিন। ভিতরে ঢুকে টুপুর তো রীতিমতো হতাশ। ছাত্রছাত্রী কোথায়? স্কুল প্রায় শুনশান, দুটো-চারটে চিনা কুচোকাঁচা দেখা যাচ্ছে শুধু। সবে তো দেড়টা, আজ আগে-আগে ছুটি হয়ে গিয়েছে নাকি?

প্রিন্সিপালের নেমপ্লেট লাগানো ঘরে এক চিনা বৃদ্ধা। পরনে গাউন। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা।

দরজায় দাঁড়িয়ে মিতিন বলল, "মে আই কাম ইন?"

মহিলা চশমার ফাঁক দিয়ে দেখলেন একবার। নরম গলায় বললেন, "ইয়েস?"

"আমরা মিস্টার ঝিয়েনের মৃত্যুর তদন্তের ব্যাপারে এসেছি," মিতিন টেবিলের সামনে গিয়ে নিজের কার্ড বাড়িয়ে দিল, "বসতে পারি?"

"ও শিয়োর।" টুপুরদেরও হাত তুলে ইশারা করলেন মহিলা, "তোমরাও বোসো।"

ইংরেজিতেই কথাবার্তা চলছে। মহিলা বিনীত ভঙ্গিতে নিজের নাম-পরিচয় জানালেন। তিনিই অধ্যক্ষা কিউ ইউয়ান। থাকেন স্কুলেরই দোতলায়। প্রায় বিয়াল্লিশ বছর ধরে এই স্কুলে রয়েছেন। অবসর নেওয়ার বয়স হওয়া সত্ত্বেও স্কুল কমিটি তাঁকে নাকি দায়িত্ব থেকে রেহাই দিচ্ছে না।

মূল প্রসঙ্গে যেতে মিতিন সময় নিল না বিশেষ। জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার ঝিয়েনের মৃত্যুটা যে অস্বাভাবিক, তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন? আপনার কি কখনও মনে হয়েছিল, মিস্টার ঝিয়েনের এরকম একটা বিপদ ঘটতে পারে?"

মিসেস ইউয়ান জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, "কখনও না। একদমই না। ঝিয়েনের কোনও শত্রু থাকতে পারে, আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।"

"সহকর্মীদের সঙ্গে মিস্টার ঝিয়েনের সম্পর্ক কেমন ছিল?"

"সহকর্মী?" মিসেস ইউয়ান ম্লান হাসলেন, "তা হলে তো আমাদের স্কুলের অবস্থাটা আগে বলতে হয়। আমাদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমতে কমতে এখন ছেচল্লিশে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা সাকুল্যে ছয়। আমাকে নিয়ে। মিসেস মিং, মিসেস ওয়া আর মিস লি। ঝিয়েন ছাড়া আর-একজনই শিক্ষক আছেন। মিস্টার ওয়াং। তা মিস্টার ওয়াংয়েরও অবসর গ্রহণের সময় হয়ে গিয়েছে। এঁদের কারও সঙ্গে ঝিয়েনের অসদ্ভাব ছিল বলে আমি শুনিনি।"

"মিস্টার ঝিয়েন কি সহকর্মীদের সঙ্গে খুব গল্পগুজব করতেন? মানে উনি তো গবেষণা করছিলেন... সেসব বিষয় নিয়ে...?"

"কথা সে সকলের সঙ্গেই বলত। তবে আমরা একটু দূরত্ব বজায় রাখতাম।"

"কেন?"

"তার কি এই স্কুলে পড়ানোর কথা? সে তো ছিল অনেক উঁচু স্তরের। এই বিদ্যালয় এখন নামেই হাই স্কুল, কিন্তু এখানে তো ক্লাস ফোরের বেশি পড়ানোই হয় না। একটু আধটু চিনা ভাষা শেখাই বাচ্চাদের, চিনের ইতিহাস-ভূগোল সম্পর্কে খানিকটা অবগত করি, আর অঙ্কের প্রাথমিক পাঠটাঠ দিই। এর জন্য কতটুকু বিদ্যে লাগে, বলো? তাই আমাদের কারওই তেমন প্রথাগত ডিগ্রি নেই। একমাত্র ঝিয়েনেরই ছিল সেটা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে একজন উজ্জ্বল ছাত্র। এম.এ পাশ। তবু সে এখানে পড়াত। এই স্কুলকে ভালবেসে। ইচ্ছে করলে সে যে-কোনও ভাল জায়গায় যেতে পারত, কিন্তু যায়নি। আমরা সবাই ঝিয়েনকে খুব সমীহ করতাম। আমাদের মতো স্বল্পশিক্ষিতদের সঙ্গে সে গবেষণার বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেই বা কেন, আর আমরা তা বুঝবই বা কী! তবে জানতাম, সে চিনাদের গৌরব-বৃদ্ধির জন্য পড়াশোনা করছে।"

"তার মানে কোনও ওয়ালহ্যাঙ্গিং বা কোনও ম্যাপ কেনার ব্যাপারে তিনি আপনাদের কাউকে কিছু বলেননি?"

"মারা যাওয়ার দিন সকালে আমাকে একবার বলেছিল কী একটা যেন কিনতে যাবে। ভীষণ খোশমেজাজে ছিল সেদিন। বেরনোর মুখে মুখে প্যাসেজে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছিল, তখন মোবাইলে কার যেন একটা ফোন এল। তাঁর সঙ্গেও খুব হেসে হেসে কথা হল খানিক।"

"চিনা ভাষায়?"

"না। ইংরেজিতে। ...তারপর তো হুড়মুড় করে বেরিয়েই গেল।" মিসেস ইউয়ান চশমা খুলে চোখ মুছলেন, "কে জানত ওটাই তার শেষ যাওয়া! ছেলেটা আমাকে জিয়ের মতো, মানে বড় দিদির মতো দেখত। আমার ছোট ভাই আর রইল না।"

"আর-একটা কথা। আপনি কি স্মরণ করতে পারেন, মোবাইলে উনি কী বলছিলেন?"

মিসেস ইউয়ানের বলিরেখা এসে যাওয়া কপালে ভাঁজ বাড়ল।

দু'-চার সেকেন্ড চিন্তা করে বললেন, "শুধু তো 'ঠিক আছে' 'ঠিক আছে' করছিল। একবার বোধহয় সাড়ে চারটে শব্দটা উচ্চারণ করল..."

"কোথাও যাওয়ার কথা, বা কারও সঙ্গে দেখা করার কথা বলছিলেন কী?"

"সেটা তো বলতে পারব না।" মিসেস ইউয়ান বড়সড় একটা শ্বাস ফেললেন, "এবার বোধহয় আমাদের স্কুলটা উঠেই যাবে। ঝিয়েনের নাম দেখে দু'-চারজন অভিভাবক তা-ও ছেলেমেয়ে পাঠাত, আর তো সেই আকর্ষণটুকুও রইল না। ...এমনিই তো কেউ আর চিনে ভাষায় পড়াশোনা করতে চায় না, সবাই ছুটছে ইংরেজি মাধ্যমের দিকে...। কেনই বা ছুটবে না? ইংরেজি না জানলে কি আর

চাকরি পাবে? ...আমার নাতিকেই তো এই স্কুলে ভর্তি করতে পারলাম না। ছেলে, ছেলের বউ, দু'জনেই এমন আপত্তি জুড়ল! ...অথচ আমাদের ভাষার কত ঐশ্বর্য ছিল...”

দুঃখী-দুঃখী মুখে একটানা বলে চলেছেন মিসেস ইউয়ান। তাঁর মন খারাপটা টুপুরকেও ছুঁয়ে যাচ্ছিল। সত্যি, ইংরেজি ছাড়া বাকি সব মাতৃভাষারই বুঝি একই হাল।

স্কুল ছুটির ঘণ্টা পড়ল। বাচ্চারা বেরোচ্ছে ক্লাসরুম থেকে। টুপুরদের নিয়ে স্কুলের স্টাফরুমে এলেন মিসেস ইউয়ান। শিক্ষক-শিক্ষিকারা যাওয়ার তোড়জোড় করছিলেন, মিস্টার ঝিয়েনের সম্পর্কে মিতিন জানতে এসেছে শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন তাঁরা। প্রত্যেকেই হায়-হায় করছেন। এক মধ্যবয়সি শিক্ষিকা তো হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন। আলাপচারিতা কাম জিজ্ঞাসাবাদ সেরে টুপুররা যখন বেরোল, সূর্য অনেকটাই পশ্চিমে হেলে গিয়েছে।

বাইরে এসে মিতিন বলল, “চল, এবার একটু লিয়াংয়ের বাড়ি যাই। লিয়াংয়ের বাবা দুপুরে বাড়ি থাকেন বলছিলি না?”

শুধু লিয়াংয়ের বাবা নন, লিয়াংয়ের মা'ও আজ আছেন বাড়িতে। শনিবার লিয়াংদের লন্ড্রি দু'টোয় বন্ধ হয়, দুপুরবেলা লিয়াংয়ের মাকেও তাই বেরোতে হয়নি। মিতিনদের আগমনে ববকাট চুল, শক্ত-সমর্থ চেহারার চৈনিক মহিলাটি বেজায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কীভাবে অভ্যর্থনা করবেন যেন ভেবে পাচ্ছেন না। ঝটিতি বরফশীতল লেমন স্কোয়াশ এসে গেল, সঙ্গে স্যান্ডউইচ, পেস্ট্রি, কাস্টার্ড। মেইলি হাতে হাতে সাহায্য করছে মাকে। তার কাঁধ ছোঁয়া চুলে আজও সেই নীল উল। তার মায়ের চুলেও। ছোট-ছোট চুলে উলের টুকরোটা বারবার ক্লিপ করতে-করতে লিয়াংয়ের মা কতবার যে জিজ্ঞেস করলেন টুপুরদের দুপুরের খাওয়া হয়েছে কিনা। খেলে এখনই তিনি বানিয়ে দিতে পারেন, সংকোচ করার কোনও প্রয়োজন নেই, ইত্যাদি-ইত্যাদি।

লিয়াংয়ের বাবা অবশ্য আজ খুবই ম্রিয়মাণ। কথাই বলছেন না বিশেষ। ভাইয়ের মৃত্যুতেই তিনি যথেষ্ট শোকাহত ছিলেন, খুন হওয়ার সংবাদে যেন একেবারেই বিপর্যস্ত। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর বিমর্ষ গলায় মিতিনকে জিজ্ঞেস করলেন, "ঝিয়েনের স্কুলে গিয়ে কেনও লাভ হল ম্যাডাম?"

মিতিন বলল, "একটা দরকারি তথ্য পাওয়া গেল। সেদিন স্কুল থেকে বেরনোর মুখে-মুখে মিস্টার ঝিয়েনের মোবাইলে একটা কল এসেছিল। সম্ভবত কেউ একজন আপনার ভাইয়ের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল। বিকেল সাড়ে চারটেয়।"

লিয়াংয়ের মা বিস্মিত স্বরে বললেন, "কই, এ খবরটা তো আমাদের কেউ জানায়নি!"

"ফোনটা এসেছিল মিসেস ইউয়ানের সামনে। উনিও খুব আপসেট হয়ে পড়েছেন তো, তাই হয়তো কথাটা ঠিক মাথায় ছিল না। আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎই মনে পড়ে গেল।"

"উনি কি বলতে পারলেন কার ফোন ছিল?"

"না।"

"তা হলে তো আর জানাও যাবে না।" লিয়াংয়ের বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "মোবাইলটাই তো মিসিং।"

"তাতে কিছু যায় আসে না মিস্টার ঝাও। সেদিন আপনার ভাইয়ের মোবাইলে কোন-কোন নাম্বার থেকে কল এসেছিল আমি জেনে নেব। যে কোম্পানির কানেকশন, তাদের কাছে সবই রেকর্ডেড আছে।"

"ইজ় ইট? তা হলে তো কালপ্রিট ধরাই পড়ে গেল।"

"অত সহজ নয় বোধ হয়। ফোন করে কেউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেই কি প্রমাণ হয় দু'জনের দেখা হয়েছিল? আর হলেও সেই যে খুনি, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?"

লিয়াংয়ের মা অস্ফুটে বললেন, "ও। তা হলে এখন কী করবেন?"

"দেখি। ইনফরমেশনগুলো ভালভাবে যাচাই করি। আর-একবার স্বপন দত্তর কাছেও যেতে হবে।" মিতিন একটা স্যান্ডউইচ তুলল। ছোট্ট কামড় দিয়ে বলল, "এবার আপনাদের কি দু'-চারটে প্রশ্ন করতে পারি? পার্সোনাল?"

"বলুন কী জানতে চান?"

"ওই ওয়ালহ্যাঙ্গিং... মানে ওই ম্যাপের কথাটা আপনারা ছাড়া আর কে কে জানতেন?"

লিয়াংয়ের বাবা বললেন, "ওটা যে অত মূল্যবান ম্যাপ, সেটা তো আমরাই জানতাম না। সুতরাং আমাদের মাধ্যমে কারও জানার প্রশ্নও আসে না।"

"তা ঠিক।" মিতিন মাথা দোলাল, "তবে মিস্টার ঝাও ঝিয়েন যদি আপনাদের কমিউনিটির কারও কাছে গল্পটল্প করে থাকেন..."

"অসম্ভব। সে আমাদেরই বলেনি, অন্য লোকদের বলতে যাবে কেন?"

লিয়াংয়ের মা বললেন, "তা ছাড়া আমাদের ঝিয়েন তো কারও সঙ্গে সেভাবে মিশতই না। আর এই ছাতাওয়ালা গলি থেকে বেশিরভাগ চিনাই তো চলে গেছে সেই ট্যাংরায়। এখন আমাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই প্রায় ওখানে। সামাজিক অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠান ছাড়া ঝিয়েনের সঙ্গে তাদের দেখাসাক্ষাৎই হত না।"

"অর্থাৎ আপনারা নিশ্চিত, ওই ম্যাপের লোভে আপনাদের সম্প্রদায়ের কারও পক্ষে ওই কাজ করা সম্ভব নয়?"

"দু'শো ভাগ নিশ্চিত। ওই সব ম্যাপট্যাপ, ইতিহাস-টিতিহাস নিয়ে আমরা তো কেউ ভাবিই না। ঝিয়েন ছিল নেহাতই ব্যতিক্রম। এখানকার চিনারা, মানে আমরা তো ব্যস্ত থাকি কীভাবে দু'বেলা

রুটির জোগাড় করব, কী করে একটা চাকরি জোটাব, কিংবা ব্যবসা চালাব, এসব নিয়ে। ঝিয়েনকে তো তাই প্রায় আমাদের সমাজের বাইরের লোক বলে ধরে নেওয়া যায়।”

মিতিন শরবত শেষ করে মুখ মুছল। হেসে বলল, “ধন্যবাদ। আপনারা আমার কাজটাকে অনেক সহজ করে দিলেন। আশা করছি, শিগগিরই মিস্টার ঝাও ঝিয়েনের হত্যাকারীকে ধরে ফেলতে পারব।”

রবিবার দুপুরে ছোটখাটো একটা সভা বসেছে মিতিনের ড্রয়িংরুমে। মিতিন, টুপুর, পার্থ ছাড়াও সেখানে কুশল হাজির আজ। কুশলকে কাল বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আসার সময়েই আজ মধ্যাহ্নভোজের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল মিতিন। আর খ্যাঁটনের গন্ধ পেলে কুশল কি না এসে পারে! বার্ডফ্লু’র অজুহাতে সম্প্রতি বাড়িতে মুরগি আনছে না পার্থ, তবে চিংড়ির মালাইকারি আর মাটনকোর্মা মিলিয়ে মেনু মন্দ হয়নি আজ। এখন ভরাপেটে শুরু হয়েছে ঝিয়েন হত্যার চুলচেরা বিশ্লেষণ। আর সম্ভাব্য আততায়ীর অনুসন্ধান।

পার্থ মন্তব্য করল, “যাক, একটা ব্যাপারে অন্তত তো তোমরা নিশ্চিন্ত হয়েছ। খুনি কোনও চিনেম্যান নয়।”

মিতিন বলল, “এখনও পর্যন্ত তো তাই মনে হচ্ছে।”

কুশল বলল, “তা হলে রইল পড়ে চার। স্বপন দত্ত আর ওই তিন প্রোফেসর। থুড়ি, পাঁচ। স্বপন দত্তর দোকানের মন্টুকেও তো ধরতে

হবে। যদিও আমার মনে হয় না, খুনটা সে করেছে। ভুল করে তাকে ধরেছে পুলিশ।"

"বটেই তো।" টুপুর মুখে ভাজা মৌরি পুরল। চিবোতে চিবোতে বলল, " আমার মনে হয়, মন্টু বেচারাকে অযথা হ্যারাস করার কোনও মানেই হয় না। আঙ্কল ঝিয়েন জিনিসটা কেনার দিন সে তো কাজেই যায়নি!"

পার্থ বলল, "ওটাই হয়তো মন্টুর চাল। আগের দিন যখন স্বপন দত্ত জিনিসটাকে দশ হাজারে বেচতে রাজি হয়ে গেল, তখনই ও প্ল্যান ছকে নিয়েছে।"

টুপুর বলল, "তার মানে বলতে চাও মন্টু বুঝে গিয়েছিল জিনিসটা দামি?"

"আন্দাজ করেছিল। মিস্টার ঝিয়েন যেভাবে জিনিসটার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। প্লাস, আর-একজন ভদ্রলোকও তো এসেছিলেন জিনিসটার খোঁজে। ...এইসব থেকেই মন্টু হয়তো ভেবেছিল, জিনিসটা হাতিয়ে অন্য কোথাও বেচতে পারলে অনেক অনেক বেশি টাকা পাবে। এখন তো যা শুনছি, জিনিসটার দাম বিশ-পঞ্চাশ লাখ হওয়াও বিচিত্র নয়। এর থেকে কত অল্প টাকার জন্য আজকাল মানুষ মানুষকে খুন করে দেয়।"

"মেসোর কথায় কিন্তু যুক্তি আছে রে টুপুর।" কুশল পার্থর দিকে হেলে গেল, "দ্বিতীয় যে লোকটা জিনিসটার খোঁজে এসেছিল, সেই হয়তো মন্টুকে টোপ দিয়ে... মানে টাকার লোভ দেখিয়ে মন্টুকে দিয়েই করিয়েছে কাজটা।"

"চান্স খুব কম।" টুপুর মাথা ঝাঁকাল, "মন্টুর যদি জিনিসটা হাতানোরই ইচ্ছে থাকত, সহজেই তো দোকান থেকে নিয়ে পগারপার হত। খামোখা খুনের ঝুঁকি সে নেবে কেন?"

"তা হলে পুলিশ তাকে আদৌ ধরলই বা কেন?"

"অনেক সময়ই এরকম এক-আধজনকে ধরে পুলিশ।" অনিশ্চয় আঙ্কল বলেন, কাউকে গ্রেপ্তার না-করতে পারলে খবরের কাগজের লোকরা নাকি খুব বাঁকা বাঁকা কথা শোনায়। দেখে নিস, মন্টুকে দু'-চার দিন পরে ছেড়েও দেবে।"

"তোদের মন্টু-গবেষণা থামাবি?" হঠাৎই সরব হয়েছে মিতিন। সোফায় বাবু হয়ে বসে বলল, "মন্টু ছাড়াও আর যে চারজন সন্দেহভাজন আছে, তাদের কথায় আয়।"

পার্থ বলল, "মন্টুকে যদি বাদ দাও, তা হলে তো নেক্সট সাসপেক্ট তোমার স্বপন দত্ত। সে তো স্বীকারই করেছে, সেদিন সে রেসের মাঠে গিয়েছিল। সেখান থেকে প্রিন্সেপ ঘাট আর কদ্দুর? আর-একটু চাপ দিলেই পেট থেকে বেরিয়ে আসবে, রেসের মাঠ নয়, সে সেদিন গিয়েছিল প্রিন্সেপ ঘাটেই। মিস্টার ঝিয়েনকে ফলো করে।"

মিতিন হেসে ফেলল, "বড্ড গোঁজামিল দিয়ে ফেলছ, পার্থ। মিস্টার ঝিয়েন জিনিসটা কিনে চলে যাওয়ার পর দোকান বন্ধ করতেও তো পাঁচ-দশ মিনিট সময় লাগে। যদি ধরেও নিই, স্বপন দত্ত সঙ্গে সঙ্গেই দোকানের শাটার নামিয়ে মিস্টার ঝিয়েনের পেছন-পেছন দৌড়েছে, তা হলেও ব্যাপারটা দাঁড়ায় কী? ডোন্ট ফরগেট, মিস্টার ঝিয়েনের জিনিসটা কেনা এবং খুন হওয়া, এর মাঝে প্রায় ঘণ্টা দু'-আড়াইয়ের ব্যবধান।"

"সো?" পার্থ হাত ওলটালো, "দু'-আড়াই ঘণ্টা ধরে একটা লোককে ফলো করা যায় না? আমিই তো তোমার ডিরেকশন মতো একজনকে ছ'ঘণ্টা ফলো করেছিলাম। স্বপন দত্ত হয়তো ধাওয়া করতে করতে, ধাওয়া করতে করতে, জায়গামতো মিস্টার ঝিয়েনকে পেয়ে..."

কুশল বলল, "কিন্তু মেসো... স্বপন দত্ত তা হলে জিনিসটা আদৌ বেচল কেন?"

"ইনস্ট্যান্ট টাকার লোভে। এবং টাকাটা পেয়েই মনে হয়েছে বিক্রি করাটা গোখ্‌খুরি হয়ে গেল। আবার এও হতে পারে, জিনিসটা কেনার পর মিস্টার ঝিয়েনই হয়তো খুশির আতিশয্যে জিনিসটা যে কত মূল্যবান, সেটা বলে ফেলেছিলেন। তাতেই স্বপনের লোভ চাড়া দিয়ে ওঠে।"

"সব ঠিক আছে।" টুপুর মাথা নাড়ল, "তবে তুমি কিন্তু দুটো পয়েন্ট মিস করে যাচ্ছ পার্থমেসো। এক নম্বর, আঙ্কল ঝিয়েনকে মাথায় আঘাত করার পরে একটা গাড়ি কিন্তু সত্যি-সত্যিই তাঁকে চাপা দিয়েছিল। রাস্তার মধ্যিখানে নয়, একেবারে ফুটপাতের গা ঘেঁষে। তার মানে, গাড়ি চাপা দেওয়াটাও হয়েছিল প্ল্যানড ওয়েতে। যে-লোকটার মাথায় হঠাৎ জিনিসটা হাতানোর মতলব এসেছে, তার পক্ষে কি এত কিছু প্ল্যান করে ঘটানো সম্ভব? প্রথমে মাথায় ডান্ডা মেরে ফুটপাতের ধারে ফেলে রাখল, তারপর একটা গাড়ি জোগাড় করে এনে চাপা দিল... অত সোজা? সেকেন্ডলি, দ্য মিস্টিরিয়াস ফোন কল। আঙ্কল ঝিয়েনের সঙ্গে কারও একটা সাড়ে চারটেয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। কার সঙ্গে? কোথায়? কেন? নিশ্চয়ই সেই লোকটা স্বপন দত্ত নয়?"

"হয়তো ছিল একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট। মিস্টার ঝিয়েন সেখানে যাননি!"

"অর্থাৎ অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেও সেটি রক্ষা না-করে, নিজের বাড়িতেও না-ফিরে, মিস্টার ঝিয়েন মনের আনন্দে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে চলে গেলেন!" মিতিন মুখ বাঁকাল, "কী অকাট্য যুক্তি!"

"হতে পারে না?"

"হতে পারে কি পারে না, সেই গোলকধাঁধায় না-ঢুকে বরং দেখা যাক, কী কী হয়েছে। খুন। গাড়ি চাপা। ম্যাপ চুরি। মোবাইল মিসিং। যে-লোকটা খুন করেছে, ম্যাপ আর মোবাইল যদি সে-ই নিয়ে

থাকে, তার থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি। খুনি অবশ্যই ভেবেছে, মোবাইল ফোন থেকে তার পরিচয়টা জানাজানি হয়ে যেতে পারে, তাই ম্যাপের সঙ্গে সঙ্গে সেটাও সরাতে হয়েছে তাকে। এবং সেই অ্যাঙ্গল থেকে দেখলে স্কুলে মিস্টার ঝিয়েনের কাছে আসা ফোনটা কিন্তু সত্যিই খুব ভাইটাল। কলটাকে ডিটেক্ট করার জন্য আমি কালই ভবানী ভবনে আই জি সাহেবকে জানিয়েছি। অনিশ্চয়বাবু কাল দুপুরের মধ্যেই আমায় ডিটেলটা দিয়ে দেবেন।"

"তবে যে মাসি তুমি কাল বললে ওই ফোন থেকে কিছু প্রমাণ হয় না?"

"সে তো হয়ই না। কিন্তু আর-পাঁচটা এভিডেন্সের সঙ্গে মিলিয়ে ... ধর, যদি দেখা যায়, যে ফোন করেছিল সে ম্যাপটার মূল্য সম্পর্কে জানে ... ম্যাপটা পেতে সে আগ্রহী ... তা হলে কলটাকে এভিডেন্স হিসেবে তো ব্যবহার করাই যায়। অবশ্য তার চেয়েও আগে যা জরুরি সেটা হল, আমাদের বের করতে হবে কীভাবে হত্যাকাণ্ডটা হয়েছে। এবং স্বপনবাবু কিংবা বাকি তিনজন সাসপেক্টের পক্ষে ওইভাবে খুন করাটা আদৌ সম্ভব, কি না।"

পার্থ চোখ বড় বড় করে বলল, "তার মানে তুমি বলতে চাইছ, ওই তিন অধ্যাপকের একজন মিস্টার ঝিয়েনকে মারতে পারেন?"

"হতেই পারে। বাসববাবু অত্যন্ত রুক্ষ, বদমেজাজি লোক, কিন্তু আবার দরকারমতো মাথা ঠান্ডাও করে ফেলেন। ভান করেন মিস্টার ঝিয়েনের মৃত্যুর ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, আবার মিস্টার ঝিয়েনকে সমাধি দেওয়ার দিন তিনি সেখানে উপস্থিত হন। অপরাধ প্রবণতাও আছে। বইয়ের পাতা কাটতে গিয়ে ধরাও পড়েছিলেন। অর্থাৎ বেশ জটিল চরিত্র। তরুণবাবু খুবই ভদ্র সভ্য মানুষ। কিন্তু মিস্টার ঝিয়েনের ব্যাপারে তাঁকে কি একটু বেশি শীতল মনে হল

না? ওই আপাত উদাসীনতাটা এক ধরনের অভিনয় নয় তো? শিবতোষবাবু আবার অতি অমায়িক। মিস্টার ঝিয়েনকে যথেষ্ট ভালবাসতেন বলেও মনে হল। কিন্তু দু'জনের গবেষণার বিষয় প্রায় কাছাকাছি। অর্থাৎ চোরা রেষারেষি থাকলেও থাকতে পারে। অবশ্য তরুণবাবুও প্রায় একই সাবজেক্টের উপর কাজ করছেন ...।"

টুপুর কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "বুঝেছি। তুমি সবাইকে সমান সন্দেহের চোখে দেখছ।"

"তাই তো নিয়ম রে। প্রমাণ ছাড়া সন্দেহের বাড়া-কমা হবে কী করে?"

পার্থ গোমড়া মুখে বলল, "তা অধ্যাপক মশাইদের কেউ একজন খুনটা করলেন কীভাবে?"

"আমি বলব?" কুশল হাত তুলল, "তিনজন প্রোফেসরই ম্যাপটার কথা জানতেন। আমাদের সে কথা বলেওছেন। এঁদের মধ্যেই একজন ম্যাপটা বাগানোর জন্য প্রিন্সেপ ঘাটের সামনে আঙ্কল ঝিয়েনকে আসতে বলেন ... তারপর গাড়ি নিয়ে গিয়ে ..."

"এক সেকেন্ড।" টুপুর কুশলকে থামাল, "গাড়ি চাপা দেওয়ার আগেই কিন্তু আঙ্কল ঝিয়েনের মাথায় আঘাত করা হয়েছে রে।"

"সে আর কী এমন কঠিন কাজ! আঙ্কল ঝিয়েন যখন আহ্লাদে আটখানা হয়ে ম্যাপটা দেখাচ্ছেন, তখনই হয়তো ..."

"তবু একটা 'কিন্তু' থেকেই যাচ্ছে রে কুশল। আঙ্কল ঝিয়েনের তো ন্যাশনাল লাইব্রেরিতেই অধ্যাপক বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হত। হঠাৎ একটা শুনশান জায়গায় ... অড রুটে দেখা করতে বললে আঙ্কলের তো খটকা লাগা উচিত।"

"গুড পয়েন্ট। ভেরি গুড পয়েন্ট," মিতিন তারিফ করল, "একটা অদ্ভুত জায়গায় মিট করতে চাইলে মিস্টার ঝিয়েনের তো অবাক হওয়ারই কথা। অ্যাটলিস্ট টেলিফোনে কেন টেন ধরনের একটা প্রশ্ন

তো তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে। অথচ মিসেস ইউয়ানের স্টেটমেন্ট বলছে, মিস্টার ঝিয়েন সেদিন খুব স্বাভাবিক স্বরেই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করেছিলেন।"

"তা হলে?"

"ভাবতে হবে। মোডাস অপারেন্ডিটা ভাবতে হবে। নিজেকে খুনির জায়গায় প্লেস করে বুঝতে হবে আমি হলে এ ক্ষেত্রে কীভাবে এগোতাম।"

বলেই তড়াং করে উঠে দাঁড়িয়েছে মিতিন। পাশের ঘরে গিয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে মোবাইলে। স্বর কানে আসে, তবে সংলাপগুলো শোনা যায় না ঠিকমতো। মিনিট দশেক পর ফিরল ড্রয়িংরুমে। নাইটি-হাউসকোট বদলে সালোয়ার-কামিজ পরে নিয়েছে, চুল টানটান করে বাঁধা।

টুপুর অবাক মুখে বলল, "এ কী? তুমি এখন বেরোচ্ছ নাকি?"

ঘড়ির চেন বাঁধতে বাঁধতে মিতিন বলল, "হুঁ, একটু ঘুরে আসি।"

"কোথায় যাবে?"

"স্বপন দত্তর কাছে।"

"হঠাৎ?"

"দরকার আছে।"

"কিন্তু কিউরিও শপ তো আজ বন্ধ!"

"স্বপন দত্তর বাড়িতে যাব। ভবানীপুর। কথা বলে নিয়েছি।"

চটি গলিয়ে, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল মিতিন। কুশল, টুপুর, পার্থ, তিনজনেই হতভম্ব।

কুশল ভ্যাবলা মুখে বলল, "মাসি তো স্বপন দত্তকে ক্লিন চিট দিয়ে দিয়েছিল! হঠাৎ আবার তাকে ...?"

"কে জানে কী মতলব!" পার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, "তোমাদের মাসির থই পাওয়া মুশকিল।"

মিতিন সন্ধেবেলা ফেরার পর কুশলের সঙ্গে বাড়ি চলে এল টুপুর। মিতিনই বলল, টুপুরের আর রাতে থাকার দরকার নেই, সে বরং কাল বাড়ি থেকেই স্কুলে যাক। স্বপন দত্তর বাড়ি কেন গিয়েছিল, সেখানে কী হল, তা-ও জানা হল না টুপুরের, এটা-ওটা বলে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল মিতিন।

মাসির উপর খুব অভিমান হচ্ছিল টুপুরের। নয় নয় করে বেশ কয়েকটা কেসে সে মাসির পাশে পাশে থেকেছে, এখনও যেন তার উপর মাসির সেভাবে আস্থা জন্মাল না! অথচ মাসির থট প্রসেসটা জানতে পারলে টুপুর তো নিজের চিন্তাভাবনাকেও সেই খাতে বইয়ে দিতে পারে। তা ছাড়া ঝিয়েন আঙ্কলের কেস তো টুপুরের দৌলতেই পেয়েছে মিতিনমাসি, সে সুবাদেও তো টুপুরের জানার অধিকার আছে সব কিছু। নয় কি? কুশলের সামনে কি আলোচনা করতে চায় না? উঁহুঁ। তা হলে তো রাতে টুপুরকে থেকে যেতেই বলত।

না, মিতিনমাসি এখনও টুপুরকে এলেবেলেই ভাবে। সে যে একাই তদন্তটা শুরু করেছিল, সেটাকে পর্যন্ত আমল দিল না!

টুপুরের অভিমানটা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হল না। সোমবার স্কুল থেকে ফিরতেই মিতিনের ফোন, "তোকে একটা ইনফরমেশন দেওয়ার ছিল রে।"

মন খারাপটা লুকোতে পারল না টুপুর। ভার গলায় বলল, "আমি জেনে কী করব?"

"তবু শুনে রাখ।" মিতিন নির্বিকার, "মিস্টার ঝিয়েনের মোবাইলে ওই সময়ে আসা কলটাকে ট্রেস করা গিয়েছে।"

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে টুপুরের উদাসীনতা উধাও। মুখ থেকে উত্তেজনা ছিটকে এল, "কে? কার ফোন?"

"তা জানা যায়নি। তবে নম্বরটা একটা পাবলিক বুথের।"

"অ্যাঁ?"

"অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ। আলিপুর চিড়িয়াখানার সামনের এক বুথ থেকে করা হয়েছিল।"

"ও। ... তা হলে কী হবে?"

"কী আর হবে! আমি তো এরকমটাই গেস করেছিলাম। ঘটে এটুকু বুদ্ধিও না-থাকলে তেমন ক্রিমিনালের সঙ্গে লড়ে মজা কোথায়!"

"এখন কী করবে?"

"মাছের চার বানাব।"

"মানে?"

"দেখতেই পাবি।"

"হেঁয়ালি করছ কেন? আমাকে কি কিছুই বলা যায় না?"

"আহা, চটিস কেন? শার্লক হোম্‌স কি প্রতিটি খুঁটিনাটি ওয়াটসনকে বলতেন? নাকি তোদের ফেলুদা বলেছেন তোপসেকে? ... শোন, একটু সাসপেন্স থাকা ভাল। লাস্ট রাউন্ডের চমকটা তা হলে পুরোপুরি এনজয় করা যায়।"

এর পর আর টুপুরের কী বলার থাকে! অগত্যা ফোন নামিয়ে রাখতেই হয়। মনের উৎকণ্ঠাটুকু রেখে দিতে হয় মনেই। এবং একা-একা ডুবে থাকতে হয় ভাবনার অকূল পাথারে।

পরদিনটা নিরামিষ কাটল। মিতিনমাসির দিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই। বিকেলবেলা কুশল এসে খোঁচাখুঁচি করল

খানিকক্ষণ, কেঠো হাসি ছাড়া তাকে আর কিছুই উপহার দিতে পারল না টুপুর।

বুধবার সকালে সহসা বিস্ফোরণ। মেঘলা মেঘলা আকাশ, টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে, দিব্যি আরাম করে ঘুমোচ্ছিল টুপুর। অবনী ঠেলে তুলেছেন তাকে। উত্তেজিত স্বরে বলছেন, "অ্যাই টুপুর, ওঠ। দ্যাখ দ্যাখ, খবরের কাগজে কী বেরিয়েছে!"

টুপুর ঘুম-জড়ানো গলায় বলল, "কী?"

"তোদের সেই ম্যাপ নিয়ে এক বিশাল সমাচার।"

প্রভাতী আলস্য পলকে খানখান। টুপুর ঝাঁপিয়ে পড়ল খবরটার উপর। প্রথম পাতার নীচের দিকে বড়সড় হেডিং—

অবশেষে চিনাদের ঘরে ফিরছে দুষ্প্রাপ্য চৈনিক ম্যাপ

বেকবাগানের গ্র্যান্ড কিউরিও শপের মালিক স্বপন দত্ত সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এক দুষ্প্রাপ্য চিনা ম্যাপ আছে তাঁর সংগ্রহে। প্রায় সাতশো বছর আগে মো-ই-টং নামের এক চিনা শিল্পী নাকি এই মানচিত্রটি বানিয়েছিলেন। মানচিত্রটি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, ক্রিস্টোফার কলম্বাসের অনেক আগেই চিনারা পা রেখেছিল আমেরিকার মাটিতে। স্বপন দত্তর এক পূর্বপুরুষ, প্রায় দুশো বছর আগে, জনৈক চিনার কাছ থেকে পেয়েছিলেন ম্যাপখানা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সম্প্রতি ওই ম্যাপটির আদলে আঁকা একটি ওয়ালহ্যাঙ্গিং দোকানে টাঙিয়েছিলেন স্বপনবাবু, সেটিকেই আসল মানচিত্র ভেবে নিয়ে দশ হাজার টাকায় কিনে ফেলেন চিনা ইতিহাসবিদ ঝাও ঝিয়েন। কিন্তু ম্যাপখানি নিয়ে বাড়ি অবধি পৌঁছতে পারেননি তিনি, তার আগেই প্রিন্সেপ ঘাটে এক আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন, এবং নকল মানচিত্রটিও খোওয়া যায়। পুলিশ তড়িঘড়ি গ্র্যান্ড কিউরিও শপের এক কর্মচারীকে

গ্রেফতার করেছে বটে, তবে নকল মানচিত্রটি এখনও উদ্ধার হয়নি। এই ঘটনার পর থেকে স্বপন দত্ত গভীর মর্মপীড়ায় ভুগছিলেন এবং অবশেষে তিনি স্থির করেছেন মানচিত্রখানা তিনি নিহত ঝাও ঝিয়েনের পরিবারকে দিয়ে দেবেন। কোনও মূল্য ছাড়াই। চিনা অষ্টম চান্দ্রমাসের প্রথম দিনে, অর্থাৎ পাঁচ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, বেলা বারোটায় মানচিত্রটির হাত-বদল ঘটবে। বজবজের অদূরে, অছিপুরে চিনা অভিযাত্রী আৎসুর যে সমাধি আছে, সেখানেই ঝাও ঝিয়েনের দাদার হাতে পারিবারিক সম্পদটি তুলে দিয়ে ভারমুক্ত হতে চান স্বপন দত্ত।

টুপুর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। বলে কী স্বপন দত্ত? যে ম্যাপের জন্য ঝিয়েন আঙ্কলকে প্রাণ দিতে হল, সেটা আদৌ আসল নয়? মুখ দিয়ে বেরিয়েও গেল, "স্বপন দত্ত তো মহা শয়তান। একটা দু'নম্বরি ম্যাপ টাঙিয়ে রেখেছিল!"

অবনী খবরের কাগজটা ভাঁজ করতে করতে বললেন, "দু'নম্বরি বলছিস কেন? সে একটা ম্যাপের নকল শোয়ের জন্য সাজিয়ে রেখেছিল মাত্র। কেউ যদি সেটাকে মহামূল্যবান ভাবে, তাতে স্বপন দত্তর কী করার আছে?"

"তবু বলে দেওয়া উচিত ছিল। দিব্যি দশ হাজার টাকা গুনে নিল ..."

"ওরে, আর্ট অ্যান্টিক কিউরিও, এসব লাইনে দশ হাজার কিস্‌সু না। আর এই নকল জিনিস বেচা তো হরবখত হচ্ছে। নকল মোনালিসা কতবার বিক্রি হয়েছে, জানিস? ... তাও তো তোদের ঝিয়েন আঙ্কলের মৃত্যুতে তার অনুতাপ-টনুতাপ হয়েছে, বিনা পয়সায় দিয়ে দিতে চায় জিনিসটা।"

টুপুর একটুও সান্ত্বনা পেল না। গুম হয়ে বসে রইল একটুক্ষণ।

তারপর উঠে দাঁত ব্রাশ করে এসেই মিতিনমাসিকে ফোন।

"আজকের খবরের কাগজ দেখেছ?"

"হুম্।"

"কী সব বেরিয়েছে, অ্যাঁ? ম্যাপটা নাকি আসল নয়?"

"তাই তো দেখছি।"

"একটা কথা সত্যি করে বলো তো মিতিনমাসি? তুমি কি ব্যাপারটা আগেই সন্দেহ করেছিলে? স্বপন দত্তকে তাই ভয় দেখাতে গিয়েছিলে সেদিন?"

"ধরে নে তাই।"

"তা হলে এখন আমাদের মার্ডার কেসটার কী হবে?"

"সেটা যেমন চলছিল চলবে। ... আমরা তো কালপ্রিটের দিকে গুটিগুটি পায়ে এগোচ্ছি। যাক গে, কাজের কথা শোন। শুক্রবার তোকে স্কুলে যেতে হবে না। কুশলকেও ডুব মারতে বল। আমরা সেদিন দল বেঁধে অছিপুর যাচ্ছি।"

"ওখানে তো শুধু ম্যাপ দেওয়া-নেওয়া?"

"সেটাই তো একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। আমরা তার সাক্ষী থাকব।"

"লিয়াংকে সঙ্গে নেব না?"

"লিয়াং তো যাবেই। বাবা-মা-বোনের সঙ্গে। আমরা আমাদের মতো যাব। ওরা ওদের মতো। ঠিক সাড়ে ন'টায় তুই আর কুশল শেয়ালদায় চলে আয়। সাউথ সেকশনে। আমি ইলেকট্রনিক ঘড়ির নীচে ওয়েট করব।"

টেলিফোন নামিয়ে রেখে একটুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইল টুপুর। আশ্চর্য, মিতিনমাসি টের পেল কী করে, স্বপন দত্ত নকল ম্যাপ বেচেছে? মিতিনমাসির দাবড়ানির চোটেই কি লোকটা আসল ম্যাপ হাতছাড়া করতে রাজি হয়ে গেল? স্টেটমেন্ট পর্যন্ত দিয়ে

দিল কাগজে? কী বলে ভয় দেখিয়েছে মিতিনমাসি?

উঁহু, কেমন যেন ধন্দ লাগছে। জরুর ডালমে কুছ কালা হ্যায়।

শুক্রবার টুপুররা অছিপুর পৌঁছোল বেলা সাড়ে এগারোটায়। বজবজ স্টেশনে নেমে একখানা ভ্যানরিকশা ধরে বাসরাস্তা বরাবর অছিপুরের বড়বটতলা, সেখান থেকে গঙ্গার দিকে খানিকটা গিয়ে চিনেম্যানতলা। অছিপুরের এই তল্লাটে এখন আর একটা চিনা পরিবারও বাস করে না, তবে একসময় তাদের বসতি ছিল বলে নামটা রয়েই গিয়েছে। অবশ্য কালের বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে টিঁকে আছে এক চিনামন্দির, আর আৎসুর সমাধি।

মন্দিরের প্রকাণ্ড ফটকটার সামনে এসে ভ্যানরিকশা দাঁড় করাল মিতিন। আশপাশের পরিবেশের মাঝে ফটকটা যেন একটু বেমানান, বোঝাই যায় সম্প্রতি তৈরি হয়েছে। তবে নির্মাণশৈলী চিনা ধাঁচের। গেটের মাথায় থাকথাক কাঠের কারুকাজ। গেটের দু'দিকের পাঁচিলে বড় বড় দু'খানা রঙিন চক্র আঁকা, বোধহয় চিনাদের কোনও বিশেষ প্রতীক।

রিকশাভাড়া মিটিয়ে মিতিন বলল, "আয়, চট করে মন্দিরটা দেখে আসি।"

কুশলের চোখ এদিক-ওদিক ঘুরছে। কপাল কুঁচকে বলল, "কিন্তু বাকি লোকরা সব কোথায়? চারদিক তো একেবারে শুনশান!"

"যারা আসার তারা ঠিক এসে যাবে। এখনও তো বারোটা বাজেনি। আয় আয়, দাঁড়িয়ে থাকিস না।"

মন্দিরটা দ্রষ্টব্যস্থান হিসেবে এমন কিছু আহামরি নয়। মূল গেট পেরিয়ে ভিতরে গেলে সবুজ গাছপালার মাঝে আর-একখানা পাঁচিল, নিতান্ত সাদামাটা চেহারার। পাঁচিলের গায়ে আবার একখানা ছোট্ট গেট। এতই ছোট যে, কুঁজো হয়ে ঢুকতে হয় মূল প্রাঙ্গণে।

মন্দিরটাও বেশ ছোট। জুতো খুলে টুপুররা দেখে এল এক জোড়া চিনা দেবদেবীর মূর্তি আছে অন্দরে। মিতিন তাঁদের নামও বলে দিল। খুদা আর খুদি।

টুপুর বলল, "চাইনিজ়দেরও এমন ঠাকুর-দেবতা আছে আমার ধারণা ছিল না। আমি ভাবতাম চাইনিজ মাত্রই হয় বৌদ্ধ, নয় খ্রিস্টান।"

মিতিন হেসে বলল, "ভুলে যাস না টুপুর, চিনারা হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য জাতি। এদের ইতিহাস প্রায় সাত হাজার বছরের পুরনো। বুদ্ধদেব জন্মেছেন মাত্র আড়াই হাজার বছর আগে। আর যিশুখ্রিস্ট তো সেদিনের লোক, এই তো সবে দু'হাজার পেরোলেন। এদের আগেও তো চিনে দেবদেবী ছিল, পুজোআচ্চার চল ছিল। তাদের সবাই পরে বৌদ্ধ-খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছে ধরে নিচ্ছিস কেন?"

কুশল ফুট কাটল, "চিনে তো মুসলমানও আছে।"

"অবশ্যই। ইনফ্যাক্ট, যে-চিনা অভিযাত্রী কলম্বাসের আগে

আমেরিকায় গিয়েছিলেন, অ্যাডমিরাল জেং, তিনিই তো মুসলিম ছিলেন। তাঁর মূল নাম মা-সান-পাও।”

টুপুরের চোখ প্রায় কপালে, “তুমি জানলে কী করে?”

“তোর পার্থমেসোর ইনফরমেশন। সে-ও এখন তোর বাবার মতো ইন্টারনেটে চিনা ইতিহাস ঘাঁটছে।”

কথার মাঝেই বাইরে একটা গাড়ির আওয়াজ। টুপুর উৎকর্ণ হয়ে বলল, “ওই বোধহয় লিয়াংরা এসে গেল। নাকি স্বপন দত্ত?”

গাড়ির শব্দ মন্দির অতিক্রম করে গঙ্গার দিকে যাচ্ছে। টুপুর আর কুশল দৌড়ে দেখতে যাচ্ছিল, মিতিন বলল, “দাঁড়া, ছটফট করিস না। গেটের সামনে যাই চল।”

বড় ফটকটা থেকে গঙ্গার দিকে তাকালে চোখে পড়ে এক অর্ধচন্দ্রাকৃতি কাঠামো। লালচে ইটের। তারই পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে গাড়িটা। বিদেশি গাড়ি, সাদা রঙের।

কুশল জিজ্ঞেস করল, "গাড়িটা ওখানে গিয়ে দাঁড়াল কেন?"

মিতিন বলল, "ওটাই তো আৎসুর সমাধি।"

টুপুর বলল, "গাড়িটা চেনা চেনা লাগছে না?"

মিতিন গম্ভীর স্বরে বলল, "লোকটাকেও চেনা লাগবে। হুটোপাটি না করে আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে আয়।"

দু'পাশে ইটভাঁটি, মধ্যিখান দিয়ে রাস্তা। দু'-চার পা এগোতে না-এগোতে দেখা গেল গাড়ি থেকে নামছে একটা লোক। সোজা ঢুকে গেল সমাধিক্ষেত্রের ভিতরে। পরক্ষণে হনহনিয়ে বেরিয়ে এসে উঠে পড়ছে গাড়িতে।"

টুপুর প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "আরে, এ তো ...!"

"চুপ। শব্দ করিস না, শুধু দ্যাখ, কী হয়।"

আৎসুর সমাধিকে পাক খেয়ে, গঙ্গার ধারের বিশাল বটগাছটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল গাড়িটা। ফিরছে। রীতিমতো স্পিড তুলে।

টুপুর-কুশলকে হতবাক করে দিয়ে মিতিন আচমকা এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। রাস্তার একদম মাঝখানে গিয়ে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল গাড়ি। ড্রাইভারের সিটে পরিচিত মুখ। অধ্যাপক তরুণ বসু।

তরুণবাবু জানলা দিয়ে মাথা বাড়ালেন। আমতা আমতা করে বললেন, "কী ব্যাপার? আপনারাও এখানে?"

গাড়ির বনেটে ভর দিয়ে দাঁড়াল মিতিন। বাঁকা সুরে বলল, "যাক, সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে তা হলে! আমার ওপর দিয়ে অন্তত গাড়িটা চালিয়ে দেননি!"

তরুণবাবুর সৌম্য মুখে অমায়িক হাসি, "এ কী কথা! চাপা দেব কেন?"

"কারণ, চাপা দেওয়ার অভ্যেসটা যে আপনার আছে। মিস্টার

ঝিয়েনের ডেডবডির উপর দিয়ে গাড়ি চালাতে তো আপনার হাত কাঁপেনি।"

"এসব কী বলছেন আপনি?" তরুণবাবু দরজা খুলে নামলেন। হতভম্ব স্বরে বললেন, "আপনার কথার মাথামুন্ডু তো কিছুই বুঝতে পারছি না!"

"শেষ পর্যন্ত ফাঁদে পা দিয়ে ফেললেন তো প্রোফেসর সাহেব?" মিতিনের ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি, "কাগজ পড়ে মিস্টার ঝিয়েনের কাছ থেকে হাতানো ম্যাপটার উপর আস্থা রাখতে পারলেন না তো? যাচাই করতে চলে এলেন?"

"কী যা-তা বলছেন!" তরুণবাবুর মুখ লাল হয়ে গিয়েছে, "আপনারা এখানে যে-কারণে এসেছেন, আমিও সেই কারণেই এসেছি। একটা হিস্টোরিক্যাল ঘটনার সাক্ষী হতে। নাথিং মোর, নাথিং লেস। ম্যাপ হাতানো-ফাতানো...এসব আবার কী ধরনের অ্যালিগেশন?"

"কিছুই বুঝতে পারছেন না, তাই তো?" তরতর পায়ে এগিয়ে গিয়ে গাড়ির দরজা আটকে দাঁড়াল মিতিন। হাত উলটে বলল, "বেশ, থানায় চলুন তা হলে। ওখানে অভিযোগটার ফয়সালা হয়ে যাক।"

"ইউ আর গোয়িং টুউ ফার," তরুণবাবু গরগর করে উঠলেন, "জানেন, আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন?"

"ভাল মতোই জানি," মিতিনের স্বরও রুক্ষ হল, "একজন জঘন্য খুনির সঙ্গে। নিজেকে আরও বিখ্যাত করার জন্য মিস্টার ঝিয়েনের মতো সরল আলাভোলা বন্ধুকে যিনি অনায়াসে হত্যা করতে পারেন।"

"আআআমি খুন করেছি?"

"রেকর্ড তো তাই বলছে।"

"কীসের রেকর্ড?"

"আপনার কর্মকাণ্ডের। ওই দিন সাড়ে চারটের সময় আপনার গাড়ি এসে দাঁড়াল ন্যাশনাল লাইব্রেরির গেটে। আপনারই অনুরোধে ম্যাপটা আপনাকে দেখানোর জন্য সেখানে তখন অপেক্ষা করছিলেন মিস্টার ঝিয়েন। তাঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে আপনি সোজা চলে এলেন প্রিন্সেপ ঘাটে। গঙ্গার ধারে বসে ভাল করে দেখলেন ম্যাপটা। তারপর কথাবার্তা বলে বুঝে নিতে চাইলেন টাকার বিনিময়ে মিস্টার ঝিয়েন আপনাকে ম্যাপটি দেবেন, কি দেবেন না। যখন দেখলেন, মিস্টার ঝিয়েন কোনও প্রলোভনেই রাজি হবেন না, তখন আপনি চরম পন্থাটি বেছে নিলেন।"

তরুণবাবু বিদ্রুপের স্বরে বললেন, "কী রকম? লোহার রড মেরে ঝিয়েনের মাথা দু'ফাঁক করে দিয়ে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে এনে রাস্তায় ফেলে দিলাম? তারপর গাড়ির চাকায় তাকে পিষে দিলাম? এবং গঙ্গার ধারের কোনও জনপ্রাণীর সেটি চোখে পড়ল না? তাই তো? সরি। গল্পটা কিন্তু আপনার জমছে না।"

"না-জমাটাই তো স্বাভাবিক," মিতিন মৃদু হাসল, "কারণ, ওই পদ্ধতিতে মার্ডার করে তো মোটা বুদ্ধির ক্রিমিনালরা। আপনার মোডাস অপারেন্ডিটা একটু সূক্ষ্ম।"

"কী রকম?"

"আপনি হাসিমুখেই ফিরলেন গাড়িতে। মিস্টার ঝিয়েনকে পাশে বসালেন। কিন্তু গাড়ি কিছুতেই স্টার্ট হল না। নেমে বনেট খুলে গাড়ির ইঞ্জিন পরীক্ষা করতে লাগলেন। মিস্টার ঝিয়েনকেও ডাকলেন পাশে। অথবা কৌতূহলবশতও মিস্টার ঝিয়েন নিজেও নেমে এসে থাকতে পারেন। আপনি মিস্টার ঝিয়েনকে বললেন, ঝুঁকে ইঞ্জিনের ভেতরের কিছু একটা দেখার জন্যে। মিস্টার ঝিয়েন নিচু হওয়ামাত্র গাড়ির টুলবক্সের স্প্যানার দিয়ে মিস্টার ঝিয়েনের

মাথার পিছনে মোক্ষম আঘাত। চলন্ত গাড়ি বা দূরের কোনও পথচারীর সন্দেহ করার কোনও সুযোগই নেই এখানে। তার উপর তখন সন্ধে নেমেছে। মিস্টার ঝিয়েন মারা গেছেন কিনা নিশ্চিত হতে না পেরে দ্রুত তাঁর উপর দিয়ে গাড়িটা চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন। অবশ্যই ম্যাপ আর মোবাইল তার আগেই আপনার কবজায় এসে গিয়েছে। ... এ গল্পটা জমছে কি?"

"ফালতু স্টোরি শোনার আমার সময় নেই।" তরুণবাবুর স্বরে বিরক্তি ঝরে পড়ল, "যত্ত সব আষাঢ়ে কল্পনা! আমার সঙ্গে ঝিয়েনের সেদিন দেখাই হয়নি। ... সরুন, যেতে দিন।"

"দাঁড়ান।" মিতিনের গলা অস্বাভাবিক রকমের কঠিন, "আপনি যে সেদিন দুপুর দেড়টায় মিস্টার ঝিয়েনকে কল করেছিলেন, সেটা কিন্তু ডিটেক্ট করা গিয়েছে।"

"বাজে কথা। আমি ঝিয়েনকে সেদিন ফোনই করিনি।"

"আপনার মোবাইল থেকে আপনি ফোনটা করেননি। বাড়ির ল্যান্ডলাইন থেকেও না।" মিতিনের ঠোঁটে ফের এক টুকরো হাসি, "ফোনটা আপনি করেছিলেন চিড়িয়াখানার সামনের এক এসটিডি, আইএসডি বুথ থেকে।"

"মিথ্যে। মিথ্যে কথা।"

"মিথ্যে কি সত্যি সেটা বুথের ছেলেটাই বলবে। সে কিন্তু আপনার চেহারার বর্ণনা পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছে।"

"হতেই পারে না। বুথে তখন কোনও ছেলে ছিলই না। শুধু একজন মহিলা ..."

বেফাঁস কথাটা ঠিকরে বেরোতেই তরুণবাবুর বাকরোধ সহসা। মুখ পলকে ফ্যাকাশে। ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছেন।

মিতিন দু'পা এগিয়ে গেল। ঠান্ডা গলায় বলল, "সো? ... ফোনটা তা হলে করেছিলেন?"

তরুণবাবুর ঘাড় আস্তে আস্তে নুয়ে পড়ল। মুখ তুলছেন না আর। বিড়বিড় করে বললেন, "বিশ্বাস করুন, আমি ঝিয়েনকে অনেক টাকা অফার করেছিলাম। এমন গোঁয়ারতুমি করছিল, ঝপ করে মাথাটা গরম হয়ে গেল।"

"ম্যাপটা পেলে লাভ কী হত আপনার?"

"ওটা যে কত বড় আবিষ্কার! ইতিহাসের পাতায় আমার নাম লেখা থাকত।"

"শুধু নিজের নামের জন্য মিস্টার ঝিয়েনের মতো একজন ভালমানুষকে ...? আপনি তো কিউরিও শপেও গিয়েছিলেন। দোকানের মালিককেই টাকাটা অফার করতে পারতেন।"

তরুণবাবু চমকে চোখ তুলে তাকালেন। পরক্ষণেই নামিয়ে নিয়েছেন মাথা। নিস্তেজ গলায় বললেন, "চিনা ভাষা তো পড়তে পারি না। ওটাই যে মো-ই-টংয়ের ম্যাপ, নিশ্চিত হব কী করে?" বলতে বলতে পাগলের মতো মাথা ঝাঁকাচ্ছেন। দু'হাতে মুখ ঢেকে ভেঙে পড়লেন কান্নায়, "অন্যায় হয়ে গিয়েছে। ঘোরতর অন্যায় করেছি। আমার পাপের কোনও ক্ষমা নেই।"

দু'-এক সেকেন্ড তাঁকে দেখে নিয়ে পায়ে পায়ে ইটভাঁটার দিকটায় গেল মিতিন। চেঁচিয়ে ডাকল, "ওসি সাহেব, এবারে আসুন।"

জনাপাঁচেক বন্দুকধারী পুলিশ বেরিয়ে এল ইটভাঁটার পিছন থেকে। মিতিনের ইশারায় ঘিরে ফেলেছে তরুণ বসুকে।

কুশলের চোখ ছানাবড়া। টুপুরও তথৈবচ।

"একটা প্রশ্ন করব, মিতিনমাসি?"

"একটা কেন, য'টা খুশি কর।"

"তুমি গেস করলে কী করে তরুণবাবুর সঙ্গে ঝিয়েন আঙ্কলের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ন্যাশনাল লাইব্রেরির সামনেই হয়েছিল?"

"জলের মতো সোজা। ন্যাশনাল লাইব্রেরিই ছিল ওঁদের ইউজুয়াল মিটিং প্লেস। হঠাৎ অন্য কোথাও যেতে বললে মিস্টার ঝিয়েনের মনে সন্দেহ জাগত না?"

"কিন্তু ... শুধু তরুণবাবুর স্বীকারোক্তিই তো সম্বল। পরে তরুণবাবু ডিনাইও তো করতে পারেন। খুনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোথায়?"

"সেটা জোগাড় করা কিছু এমন কঠিন নয়। প্রথমত, পুলিশ ওঁর বাড়ি থেকে ম্যাপটা পেয়ে গিয়েছে। আর জেরার মুখে মার্ডার ওয়েপনের সন্ধানও উনি দিয়ে দেবেন। আরে বাবা, যতই যা হোক, ভদ্রলোক হার্ডকোর ক্রিমিনাল তো নন, বেশি চাপ সহ্য করতে পারবেন না।"

"তা বটে।" টুপুর মাথা দোলাল। মুচকি হেসে বলল, "তবে যা-ই বলো, ফাঁদটা কিন্তু তুমি জব্বর পেতেছিলে!"

অবনী ইজিচেয়ারে। চোখ কুঁচকে শুনছিলেন মাসি-বোনঝির সংলাপ। পুট করে লঘু মন্তব্য ছুঁড়লেন, "জব্বর কী রে! বল, নাটকীয়। যবনিকা পতনের আগে চরম ক্লাইম্যাক্স।"

"এ ছাড়া যে আর উপায় ছিল না, অবনীদা। আমার তিন

সাসপেক্টই অত্যন্ত সম্মাননীয় ব্যক্তি। তাঁদের কারও সঙ্গেই এমন কিছু আচরণ করা সম্ভব ছিল না, যাতে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হন। অথচ আমাকে বেড়ালটাও ধরতে হবে। ... তবে হ্যাঁ, কেসটা নিয়ে দু'-চার পা এগিয়েই টের পেলাম, সন্দেহটা এক জায়গায় ঘনীভূত হচ্ছে। তিনজনের মধ্যে একমাত্র তরুণবাবুই সেদিন দুপুর থেকে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ছিলেন ... যে-বুথ থেকে ফোন করা হয়েছে, সেটাও ন্যাশনাল লাইব্রেরির খুবই কাছে ... সুতরাং অরুণবাবুরই কল করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি ... মোবাইল নেটওয়ার্ক থেকেও ইনফরমেশন পাচ্ছি, সেদিন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তরুণবাবু মোবাইল থেকে মিস্টার ঝিয়েনকে অন্তত তিনটে কল করেছিলেন ... মিস্টার ঝিয়েনের শেষ আউটগোয়িং কলও তরুণবাবুর নাম্বারে ... কিন্তু এসবই তো ক্লু, খুনের প্রমাণ নয়। হাজারটা খরগোশ জোড়া লাগিয়ে তো একটা ঘোড়া বানানো যায় না। অতএব ছলচাতুরি ছাড়া আর পন্থা কী?"

পার্থ আর কুশল একমনে শিঙাড়া খাচ্ছিল। সহেলির হাতে বানানো। একটা গরম শিঙাড়ার কোণ ভাঙতে ভাঙতে পার্থ বলল, "আর তাই স্বপন দত্তকে পটিয়েপাটিয়ে একটা আজগুবি গপ্পো বানিয়ে ফেললে এবং অনিশ্চয়বাবুকে জপিয়েজাপিয়ে সেটা খবরের কাগজে ছাপানোর বন্দোবস্তও হয়ে গেল।"

"সত্যি, আই জি সাহেব এই কেসটায় কিন্তু দারুণ সাহায্য করলেন। আমার প্ল্যান মাফিক মন্টুকে অ্যারেস্ট করা থেকে শুরু করে ..."

"ও।" কুশল লাফিয়ে উঠল, "মন্টুকে গ্রেপ্তার করানোটা তবে তোমার চাল?"

"ইয়েস মাই ডিয়ার ইয়ংম্যান। কারণ তখনও তো আমি বুঝতে পারছি না খুনি কতটা ডেঞ্জারাস। মন্টু যে লোকটাকে দেখেছিল,

সেই লোকটাই যদি আল্টিমেটলি খুনি হয়, তবে সে তো হবে খুব মূল্যবান সাক্ষী। অতএব খুনি তাকে টার্গেট করতেই পারে। তাই মন্টুর সিকিওরিটির কথা ভেবেই ...। ইনফ্যাক্ট, নিরাপত্তার ব্যাপারটা আমি আগাগোড়াই মাথায় রেখেছি। যার জন্য স্বপন দত্ত বা লিয়াংদের আমি চিনেম্যানতলায় যেতে দিইনি।"

"তবু মন্টু বেচারাকে মিছিমিছি হাজতবাস করতে হল তো।"

"দুর, পরদিনই তো ওকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মন্টু এখন মেদিনীপুরের গ্রামে, নিজের দেশে। খবর না-পাওয়া পর্যন্ত ওর কলকাতামুখো হওয়া মানা আছে।"

সহেলি আরও এক প্লেট শিঙাড়া নিয়ে ঢুকেছেন ঘরে। আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, "হ্যাঁরে, লিয়াংয়ের বাবা ম্যাপখানা শেষ পর্যন্ত হাতে পেলেন?"

"পেয়ে যাবেন। পুলিশ আর কোর্টের কিছু ফরম্যালিটি আছে, হয়ে গেলেই ওঁর জিম্মায় দিয়ে দেওয়া হবে।"

"আহা, ওঁদের মুন ফেস্টিভ্যালের আগে পেয়ে গেলে খুব ভাল হয়। লিয়াংয়ের কাকার ইচ্ছেটা পূরণ হয় তা হলে।"

"দেখা যাক।" মিতিন শিঙাড়ায় কামড় দিল, "তবে লিয়াংয়ের বাবা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। ম্যাপটা উনি নিজের কাছে রাখবেন না। কেসের ঝামেলা মিটলেই ম্যাপখানা উনি চিনা দূতাবাসে দিয়ে দেবেন।"

"খুব ভাল ডিসিশন।" অবনী সোজা হলেন, "ওই ম্যাপ তো চিনের জাতীয় সম্পত্তি। চিনের কোনও সংগ্রহশালাই ওর উপযুক্ত স্থান।"

পার্থ বলল, "ভাবতে খুব আশ্চর্য লাগে, তাই না? ওরকম একটা ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস বজবজের কোন এক দত্ত পরিবারে দুশো বছর ধরে অবহেলায় পড়ে ছিল!"

"অবাক কাণ্ড তো বটেই। সেই কবে ফিফটিন্‌থ সেঞ্চুরির গোড়ায় অ্যাডমিরাল জেং রাজার হুকুমে নৌকোটৌকো সাজিয়ে সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন ... নৌকোয় বসে শিল্পী মো-ই-টং আঁকলেন পৃথিবীর ম্যাপখানা ... রাজরোষে পড়ে সেই ম্যাপ চলে গেল লোকচক্ষুর আড়ালে ... তারপর ঘুরপাক খেতে খেতে, ঘুরপাক খেতে খেতে, প্রায় চারশো বছর পর ম্যাপ চলে এল আমাদের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বজবজে ... সেখান থেকে এক বাঙালিবাবুর হাতে ..."

পার্থ বলল, "ভাগ্যিস বাঙালিবাবুটির বংশধর ওয়ালহ্যাঙ্গিং ভেবে ম্যাপটাকে দোকানে ঝুলিয়েছিল! জঞ্জাল মনে করে ফেলে দেয়নি! এবার ওই ম্যাপের দৌলতে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের মিথের যে কী দশা হবে!"

"যাক গে যাক, আমেরিকা আবিষ্কার নিয়ে পণ্ডিতরা যত পারেন চুল ছিঁড়ুন এখন।" মিতিন আর-একখানা শিঙাড়া তুলে নিল, "মিস্টার ঝিয়েনের কেসটা থেকে আমার কিন্তু বেশ লাভ হল।"

"মোটা টাকা পেলি বুঝি?" সহেলির প্রশ্ন ধেয়ে এল, "কত রে?"

"টাকা নয়, দিদি। জ্ঞানভাণ্ডারটা বাড়ল। চিনাদের সম্পর্কে আরও কত কিছু জানলাম।"

"কী জানলে?" পার্থর চোখ সরু, "বলো তো, চিনাদের এখন কোন বছর চলছে?"

"ভেরি এলিমেন্টারি কোয়েশ্চেন। এটা কুকুরের বছর। গত বছরটা ছিল মোরগের। তার আগেরটা বাঁদরের। এ ছাড়াও আছে ইঁদুর, ষাঁড়, সাপ, বাঘ, খরগোশ, ড্রাগন, ভেড়া, শুয়োর, ঘোড়া। মোট বারোটা জন্তুর নামে বারোটা বছর। চাইনিজ় ক্যালেন্ডারে বারো বছর পর পর সেম জন্তুর টার্ন আসে। কী ঠিক বলছি তো?"

মিতিনের তুরন্ত জবাবে পার্থ থতমত। আমতা আমতা করে

বলল, "জানো তা হলে? বলো দেখি, 'ড্রাগন বোট উৎসব' কবে হয়?"

"চিনাদের পঞ্চম চান্দ্রমাসের পঞ্চম দিনে।"

"আর 'লণ্ঠন উৎসব'?"

"প্রথম চান্দ্রমাসের পূর্ণিমার দিন।" মিতিন মিটিমিটি হাসছে, "ইন্টারনেট ঘেঁটে খুব চিনবিশারদ হয়েছ দেখছি! এবার তুমি বলো তো, চিনারা কেন মৃতদেহ সমাধি দিতে যাওয়ার সময় চটের পোশাক পরে?"

"কেন বলো তো?"

"বিয়ের কনে কেন সাত রঙের সাতটা ফিতে গরম জলে ডুবিয়ে স্নান করে?"

"করে বুঝি?"

"স্নান সেরে বিয়ের কনে কেনই বা পান্তাভাত আর হাফবয়েল ডিম খায়?"

"খায়? সত্যি?"

"কেন ড্রাগন উৎসবের দিন বাঁশপাতার বালিশের মধ্যে চাল-ডাল সেদ্ধ করে নদীতে ভাসিয়ে দেয় চিনারা?"

"জানি না তো!"

"আমিও জানি না। অথচ জানা আমাদের উচিত ছিল। কলকাতায় এত চাইনিজ়দের বাস ... দু'-চার দিনের নয়, সেই ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকে ... অথচ তাদের সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদের ইন্টারনেট ঘাঁটতে হয়।"

অবনী বললেন, "সত্যি, আমরা বাঙালিরা বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক। আমাদের মনের জানলাটা আরও খোলা দরকার।"

মাসি-মেসো আর বাবা বকবকম করেই চলেছেন। সহেলি ফুট কাটছেন মাঝে মাঝে। কুশলও কথা বলছে টুকটাক। একমাত্র টুপুরই

যা আনমনা। তার মন চলে গিয়েছে এই শহর পেরিয়ে অনেক অনেক দূরে। গাঢ় নীল মহাসাগরের বুকে। দু'পাশে ঢেউ তুলে সমুদ্র ভেঙে তরতর এগিয়ে চলেছে সারসার নৌকো। প্রকাণ্ড নৌকোর পাটাতনে দাঁড়িয়ে আছেন এক চৈনিক যোদ্ধা। তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ, বুকে বর্ম, কোমরে তলোয়ার। দূরের দিকে স্থির তাকিয়ে আছেন সেই যোদ্ধা। পাশে এক মগ্ন শিল্পী। তুলোট কাগজে ছবি আঁকছেন পৃথিবীর। ওই শিল্পী কি জানতেন, প্রায় ছ'শো বছর পর ওই ম্যাপখানার জন্য প্রাণ দিতে হবে এক গবেষককে?

আঙ্কল ঝিয়েনকে দেখেনি টুপুর। তবু তাঁর জন্য হঠাৎই খুব কষ্ট হচ্ছিল টুপুরের। কান্না পাচ্ছিল। কেন যে বেচারা ম্যাপটার কথা বন্ধুদের বলতে গেলেন! কোনও মানে হয়? কোনও মানে হয়?

সবার অলক্ষে চোখের কোলটা মুছে নিল টুপুর।

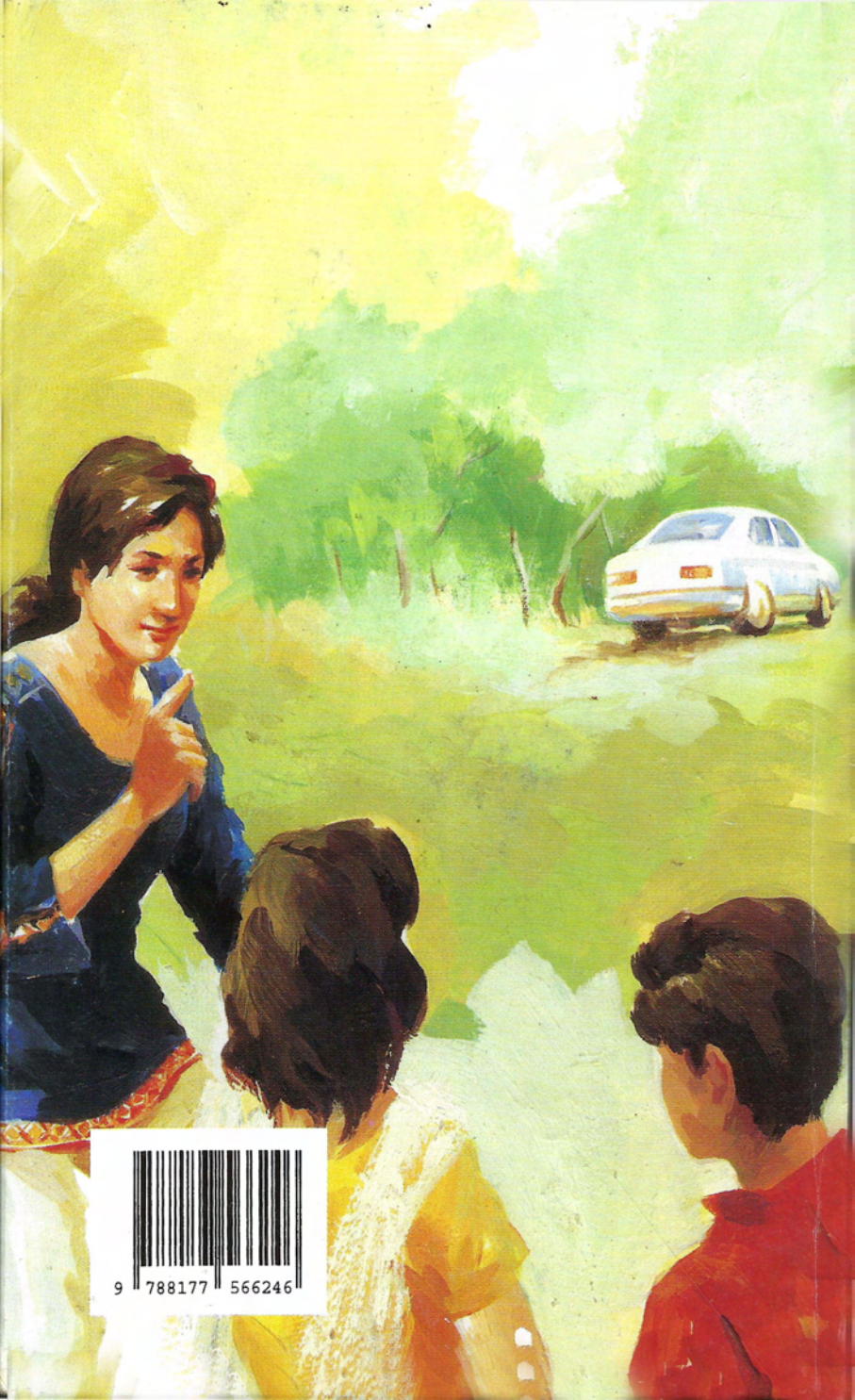

9 788177 566246